বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্কসবাদী বিজ্ঞান

দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি মার্কসবাদের মর্মবস্তু, এই সত্য বার বার গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী এবং মানবকল্যাণকামী সকল মানুষের কর্মধারা নির্দেশ করেছেন। তা হল — সঠিক বিচারপদ্ধতি এবং চিন্তাপদ্ধতি আয়ত্ত করা, সঠিক বিপ্লবী দল চিনে নিয়ে তার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, কুৎসিত বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা, উন্নত রুচি-সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্যের পরিপূরক গণআন্দোলন এবং শ্রেণীসংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম একটি লৌহদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলা।

কমরেডস্

আমাদের দেশে বর্তমানে সমস্ত দিক থেকে, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলন এবং জনসাধারণের বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামগুলোর সামনে সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। শাসক কংগ্রেস সরকার দিনের পর দিন একটা দ্বৈতনীতি অনুসরণ করে চলেছে। একদিকে প্রগতির মিথ্যা স্লোগানে মিষ্টি কথায় মানুষকে বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে, অপরদিকে এর ফলে যতটুকু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং বর্তমান সময়ে গণআন্দোলনের ভিতরে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে যে অনৈক্য, বামপন্থীদের মধ্যে যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে, তার সুযোগ নিয়ে সমস্ত রকমের প্রগতিশীল আন্দোলন, গ্রামীণ শ্রেণীসংগ্রাম, কলকারখানার মজুরদের সংগ্রাম এবং সমস্ত প্রগতিশীল, বামপন্থী ও বিপ্লবী শক্তিগুলোকে দ্রুত নিশ্চিহ্ন করার মারণযজ্ঞে মেতে উঠেছে।

এইরকম একটা পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামগুলো পরিচালনা করতে গিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গভীরভাবে স্মরণ করা দরকার। আমাদের মধ্যেও যাঁরা এগুলি জানেন এবং বোঝেন, বা যাঁরা কিছু কিছু জানতেন কিন্তু ভুলে বসে আছেন, তাঁদের সকলেরই পুনরায় নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলো স্মরণ করা দরকার। সেগুলো পুনরায় ভাল করে তাদের অধ্যয়ন করা ও তার মধ্য দিয়ে নিজেদের চিন্তাভাবনার মধ্যে যে জড়তা এবং বিভ্রান্তি এসেছে, সেগুলো দূর করা দরকার। কারণ, নিজেদের ঘর ঠিক না করতে পারলে শুধু শত্রুপক্ষের সমালোচনা করা নেগেটিভ, ক্ষতিকর। তার ফলে মারখাওয়া মানুষগুলোকে হয়তো খানিকটা উত্তেজিত করে সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা বেশি দূর এগোনো যায় না। শাসকদল কংগ্রেসের অত্যাচার ও জুলুমে যে মানুষগুলো বার বার মার খেয়েছে এবং এখনও মার খাচ্ছে, তাদের উত্তেজিত করে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এদেশে অনেক দলই বা নানান দলের সমষ্টি নানান কায়দায় ফায়দা উঠিয়েছে, কিছু আশু কাজ তারা বাগিয়ে নিয়েছে, অর্থাৎ তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, এই পর্যন্তই। কিন্তু তার দ্বারা গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেনি। কারণ, গণআন্দোলনগুলোকে কোনও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তারা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেনি। তাই আজও যারা কংগ্রেসের মিষ্টি কথায় প্রগতির স্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের তো ধরে রাখা যাচ্ছেই না, আর, যারা কংগ্রেসের অত্যাচার ও দাপটের সম্মুখীন হচ্ছে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে প্রত্যক্ষ করছে, অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝছে, তাদের যদি শুধুমাত্র কংগ্রেসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কতকগুলো উত্তেজিত স্লোগানে আমরা সংগঠিত করার চেষ্টা করি, এবং যাদের শক্তি বেশি, তারা হয়তো এটা আরও ভালভাবে করবে, তাতে সাময়িক কিছুটা কাজ হলেও শেষপর্যন্ত তাকেও রক্ষা করা যাবে না। আমরা ভুলে যেতে পারি না যে, নয়া প্রগতির স্লোগান তুলে কংগ্রেস আজকে যে জনগণের একটা বিরাট অংশকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হল, তারাও কিন্তু একদিন কংগ্রেসের অত্যাচারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ক্রমবর্ধমান হারে বামপন্থী আন্দোলনেরই সমর্থক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, আজ তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রগতিশীল আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। কাজেই, আজ যারা মার খাচ্ছে, অত্যাচার সরাসরি প্রত্যক্ষ করছে, তাদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে

গরম স্লোগান দিয়ে সাময়িকভাবে ধরে রাখতে পারলেও — আদর্শ, নীতি, আন্দোলনের রাস্তা এবং সমস্যা সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা, নেতৃত্ব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা যদি তাদের না থাকে, শুধু অত্যাচারের মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য ভুল নেতৃত্বের পিছনে তারা ছোটে, তবে সেই আন্দোলনও বেশিদূর এগোবে না।

তাই আমি আবার বলছি, লড়াই এদেশে অনেক হয়েছে, আপনারা যারা আরও বহুদিন বাঁচবেন, লড়াই তাঁরা চান বা না চান, লড়াই তাঁদের অনেকবার প্রত্যক্ষ করতে হবে। লড়াই আসবে, মার খাওয়া মানুষগুলো, নেতৃত্ব দেওয়ার লোক না থাকলেও, একটা সময়ের পর নিজেরাই বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, তাদের মধ্যে থেকেই একটা যেমন তেমন নেতৃত্ব এসে যাবে। কিন্তু, যেমন তেমন নেতৃত্ব যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যায়, তার দ্বারাও শেষপর্যন্ত কিছু হয় না। তাদের আবার মার খেতে হয়, আবার হতাশা আসে, আবার বিভ্রান্তি আসে।

এই হতাশা ও বিভ্রান্তির আসল কারণ হল, আমাদের দেশের মূল সমস্যা যা, তা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, নীতিগত প্রশ্ন আজও অপরিষ্কার রয়ে গেছে। এখনও তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। জনসাধারণের মঙ্গল করতে হবে, দেশের অগ্রগতি ঘটাতে হবে, এসমস্ত কথাগুলোই ঠিক। সকলেই একথা বলছে। আজকালকার দিনে মানুষ যেমনভাবেই হোক, সঠিকভাবে না হলেও খানিকটা ভাবছে, কথা বলছে। গ্রামের চাষী-মজুর যাদের আগে মানুষ বলেই গণ্য করা হত না, তারাও তাদের মতো করে মাথা ঘামাচ্ছে। এরকম অবস্থায় চাষী-মজুরের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য নানান মনভোলানো পরিকল্পনা বা উগ্র স্লোগান প্রত্যেকেই দিচ্ছে; যার যেমন না দিলে আজকালকার দিনে আর কেউ রাজনৈতিক দল হিসাবে জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব বা প্রভাব বজায় রাখতে পারছে না। তাই এসব কথা সব দলই বলছে। কিন্তু, শুধুমাত্র এর দ্বারা আমাদের দেশের মূল সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শগত এবং নীতিনৈতিকতা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণা প্রয়োজন, তা পরিষ্কার হয় না। অর্থাৎ, মূল যে কথাটা অপরিষ্কার থেকেই যায়, তাহল, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সমাজব্যবস্থায় আমরা বসবাস করছি, সেটা কোন নিয়মের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এল। এটা তো একদিনে হঠাৎ করে আসেনি। স্তরে স্তরে সমাজ পরিবর্তিত হতে হতে এ জায়গায় এসেছে। তার একটা ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম আছে। সেই নিয়মটি কী? দ্বিতীয়ত, ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থার চরিত্র কী? ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ কী? রাষ্ট্রের চরিত্র কী? সর্বোপরি, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কী সেই নৈতিকতা ও আদর্শবাদ যা ভারতবর্ষের জনগণের মানসিকতাকে পরিচালিত করছে? সেটা কি সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক অবশ্যপ্রয়োজনীয় নৈতিকতা ও আদর্শবাদের ধারণা ? এইগুলো যদি আমাদের জানা না থাকে, যদি বিভ্রান্তি থাকে, যদি এ সম্পর্কে নানান মনগড়া তত্ত্ব থাকে, অনৈতিহাসিক তত্ত্ব এবং ধারণা থাকে, আর সেই ধারণার উপরই আমরা যদি গায়ের জোরে বিষয়গুলো বুঝতে চাই, কিংবা সমাজটাকে পাল্টাতে চাই, সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করতে চাই — তবে তা কি সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়। অথচ, আমাদের দেশে সমাজ পরিবর্তনের নামে হচ্ছেও ঠিক তাই।

অনেকেই বলছেন, মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো এই সমাজ থেকে, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা থেকে জন্ম নিচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, না, তা নয়। তাঁরা আবার সব নানান মনগড়া তত্ত্ব চালাবার চেষ্টা করছেন। সে যাই হোক, যাঁরা সমাজব্যবস্থাকেই সমস্যার মূল কারণ হিসাবে বলছেন, তাঁরাও কিন্তু তা ভাসাভাসাভাবে বলছেন, অত্যন্ত সাধারণভাবে বলছেন। এইসব ভাসাভাসা কথা দিয়ে হবে না। বুঝতে হবে, কী সেই সমাজ এবং কীভাবে সেই সমাজ থেকে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। এটা যদি জানা যায়, তবেই কীভাবে সেই সমাজকে পরিবর্তিত করতে হবে, তার জন্য তাকে আঘাত কোথায় দিতে হবে, সেটাও ভালভাবে বোঝা যাবে।

যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভারতে বর্তমানে যে সমাজকাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থাটি টিকে আছে, তার থেকেই সমস্ত সমস্যার জন্ম হচ্ছে, যাঁরা এটাকে বিপ্লবের মারফত পরিবর্তিত করতে চান, দ্রুত আমূল পরিবর্তন আনতে চান, বিপ্লবের দায়িত্ব সত্যিই পালন করতে চান, বিপ্লবের কথা বলে মানুষকে খানিকটা গরম করে দিয়ে ভোলাতে বা বিভ্রান্ত করতে চান না, তাঁদের প্রথমেই যেটা বিচার করে বুঝে নিতে হবে, তা হচ্ছে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আর কোনও প্রগতিশীল ভূমিকা আছে, নাকি তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে বর্তমান ব্যবস্থাটা প্রগতির

দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে? এই সমাজব্যবস্থাটার চরিত্র কী? সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান কী? বিপ্লবের মারফত কাকে উচ্ছেদ করতে হবে, কাকে বসাতে হবে? দ্বিতীয়ত, যে প্রশ্নটা আসে, তাহল, সমাজব্যবস্থাটা কীভাবে পাল্টাবে? তার রাস্তাটা তো আমার আপনার মনগড়া ধারণার দ্বারা নির্ধারিত হবে না।

আগেই বলেছি, সমাজ পাল্টাবার একটা ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত রাস্তা আছে। এই রাস্তাটার হদিস প্রথম মানুষকে দিয়েছে মার্কসবাদ। আবার, আজকের যুগে, অর্থাৎ, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার যুগে, আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের যুগে যাঁরাই নিজেদের মার্কসবাদী বলেন, তাঁরা মার্কসবাদের সঙ্গে লেনিনবাদ কথাটা যুক্ত করে বলেন যে, এযুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে সমাজবিপ্লবের একমাত্র হাতিয়ার। এই হাতিয়ার কথাটার অর্থ কামান-বন্দুক-পিস্তল- বোমা নয়, এ তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই হাতিয়ারটি আয়ত্ত করতে পারলে জনসাধারণের মধ্যে চেতনার এমন মান, এমন তেজ, এমন সংগঠন শক্তি, এমন পরিকল্পনা শক্তি দানা বেঁধে ওঠে, যার জোরে শোষিত মেহনতি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে পারে — কামান-বন্দুকের পাহাড় জমা করে যারা শোষিত মানুষের লড়াইকে বাধা দিতে আসে, তারা তার হদিস পায় না।

তাই মার্কস থেকে শুরু করে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ সকলে একবাক্যে বলেছেন, সর্বহারার হাতে, শোষিত মানুষের হাতে অ্যাটম বোমা, নাপাম বোমার চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কারণ, এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদই মানুষকে জানতে ও বুঝতে শেখায় তার জীবনের সত্যিকারের সমস্যাগুলোকে, সেই সমস্যাগুলোর চরিত্র ও মূল কারণকে। অন্য সমস্ত মতবাদ শুধু কথার বাঁধুনি দিয়ে, সুললিত ভাষা ও ভঙ্গি দিয়ে, মিষ্টি মধুর কথা ও স্লোগানের আড়ালে মানুষের জীবনের আসল সমস্যাগুলোকে চাপা দিতে ব্যস্ত, মানুষের দৃষ্টিকে বিপথগামী করতে ব্যস্ত। এদের কাজ হল, যা সত্য নয়, তাকেই সত্য বলে বুঝিয়ে মানুষকে নিরস্ত রাখার চেষ্টা করা। আর, কোথায় রোগ, কোথায় সমস্যার মূল কারণ নিহিত এবং এই সমাজ যেটা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সেই পরিবর্তনের নিয়ম কী, তা ধরতে ও বুঝতে শেখায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

এই নিয়মকে জানতে পারলেই একমাত্র মানুষের পক্ষে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকে সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করা সম্ভব। যেমন, একজন বিজ্ঞানী প্রকৃতির কোনও শক্তিকে তখনই বশীভূত করতে পারে, যখন প্রকৃতির কোন কার্যকলাপ কোন নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই অন্তর্নিহিত নিয়মকে সঠিকভাবে সে আবিষ্কার করতে পারে, জানতে পারে এবং বুঝতে পারে। যখন এই পরিবর্তনের নিয়মকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয়, তখনই একমাত্র সেই পরিবর্তনের ধারায় এবং পরিবর্তনের নিয়মকে মেনেই প্রকৃতির শক্তি, বস্তুর শক্তি, বা সমাজকে, মানুষ নিজের প্রভাব বিস্তার করার দ্বারা, তার কর্মের দ্বারা পরিবর্তিত করতে পারে। তার আগে পর্যন্ত পরিবর্তন করবার, সমাজের অবস্থা বদলাবার, মানুষের অগ্রগতি ঘটাবার সমস্ত চিন্তাই হল নিছক কল্পনা, ব্যক্তির নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত মনগড়া ধ্যানধারণা। এর দ্বারা লোকঠকানো হয়, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার অপচয় হয়, সমস্ত লড়ালড়ি মিথ্যা হয়, তার দ্বারা সমাজ পরিবর্তিত হয় না। এই সত্যটা মানুষের সামনে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানই সর্বপ্রথম তুলে ধরেছে।

মার্কসবাদ আসার আগে পর্যন্ত মানুষের অবমাননা কেন ঘটছে, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার কেন ঘটছে, মানুষের মধ্যে কেন নীচতা-হীনতা দানা বাঁধছে — এসব নিয়ে যাজক-পুরোহিত সম্প্রদায়, সাধুসন্ন্যাসী, ধর্মপ্রচারক থেকে শুরু করে বড় বড় চিন্তাশীল বহু মানুষ ভেবেছেন, এসব হটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে দুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে বিপ্লব অবশ্য প্রয়োজন, সেই বিপ্লবের রাস্তার তাঁরা সন্ধান দিতে পারেননি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজতন্ত্রের কথাও বলেছেন। কিন্তু সেগুলো হয় কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, না হয় একটা স্থূল সমাজবাদী ধারণা, একটা মধুর কল্পনা যে সব মানুষ সমান হয়ে যাবে, সবাই একই রকম খাবে-পরবে। অর্থাৎ, সব মানুষকে সমান করে দিতে হবে, সব ঈশ্বরের সন্তান, এমন একটা চিন্তা তাঁদের মধ্যে কাজ করেছে। সমাজতন্ত্রের নামে, মানুষের কল্যাণ করার নামে এইরকম একটা অবাস্তব, অনৈতিহাসিক, অবৈজ্ঞানিক, কাল্পনিক মধুর স্বপ্ন তুলে ধরে, তাই নিয়ে কিছু লোক অনেক হৈ চৈ করেছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। মানুষের অবস্থা, সমাজের অবস্থা তারা পাল্টাতে পারেনি। কারণ, সমাজের চলবার নিয়ম, সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম — এসব কিছুই তারা জানত না, এগুলো প্রথম সঠিকভাবে জানিয়েছে মার্কসবাদী বিজ্ঞান।

সমাজের অগ্রগতি এবং পরিবর্তনের ধারা কী, মজুর কেন সৃষ্টি হল, কীভাবে সৃষ্টি হল, কী পদ্ধতিতে পুঁজিবাদ এল, কী পদ্ধতিতে তার ক্ষয় ধরেছে — সেই পদ্ধতি বা নিয়মগুলো না জানতে পারলে এবং সমাজব্যবস্থার যে দিকগুলো খালি চোখেই দোষের বলে দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে কিছু হাকিমী-টোটকা দিয়ে সারাবার চেষ্টা করা হলে রোগ সারবে না। রুগি মারা যাবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ চিকিৎসার উপায় হল, রোগের কারণ নির্ণয়। তাহলে, সমাজের সমস্যাগুলোর মূল কারণটাকে জানতে হবে। জানতে হবে, সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব নিয়ম কী কাজ করছে লোকচক্ষুর আড়ালে। সমাজের মধ্যে, সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত নিয়ম, অর্থনীতির মধ্যে নিহিত নিয়ম, রাষ্ট্রনীতির বিকাশের মধ্যে নিহিত নিয়ম — এই নিয়মগুলিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই মার্কসবাদী বিজ্ঞান।

এই বিজ্ঞান যদি শ্রমজীবী জনগণ একবার আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে তারা সত্য জেনে ফেলবে, সমাজকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবে। তখন তাদের সংগ্রামকে আর কামান-বন্দুক দিয়ে শেষ করে দেওয়া যাবে না। তাই দেখবেন, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী লড়াইয়ের বিরুদ্ধে কামান-বন্দুক নিয়ে যতই আসুক, ক্রমাগত যে জিনিসের উপর তারা তাদের প্রধান আক্রমণ চালায়, তাহল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। বুর্জোয়াদের এই আক্রমণের কৌশল হচ্ছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে দাও, বিপথগামী করে দাও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামেই এমন সব জিনিস চালাতে থাক, যাতে আসল বিজ্ঞানটা চাপা পড়ে যায়, মার্কসবাদের মূল ধ্যানধারণা এবং তার মর্মবস্তুটি চাপা পড়ে যায়। ওরা দেখছে, ক্রমাগত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রভাব বাড়ছে। এটা হবেই। কারণ, মানুষের মধ্যে মুক্তির যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা, সেটাই তাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি টেনে নিয়ে যায়।

আপনারা মনে রাখবেন, লেনিনবাদ হচ্ছে এই যুগে দেশকাল ভেদে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীন প্রত্যেকটি দেশের বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করবার একটি বিচার পদ্ধতি, দেখবার একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এযুগে প্রত্যেকটি দেশের বিপ্লবের মূল নীতি কী হবে, তা লেনিনবাদ তুলে ধরেছে। তাই লেনিনবাদকে বলা হয়, এই যুগের, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। একথার মানে হল, বর্তমান যুগে যখন পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু- মরণোন্মুখ, যখন সে তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেছে, দেশে দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারছে, তখন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীন পুঁজিবাদী এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করবার এবং সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করবার মূল নীতিগুলো তুলে ধরেছে লেনিনবাদ।

এই লেনিনবাদকে হাতিয়ার করেই, বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব করেছে। নভেম্বর বিপ্লবের চরিত্র জাতীয় ছিল না, তার চরিত্র আন্তর্জাতিক। নভেম্বর বিপ্লব এযুগের সকল দেশের সামনেই বিপ্লবের একটা পরিপ্রেক্ষিত ও মূল নীতিকে তুলে ধরেছে। নভেম্বর বিপ্লব দেখিয়ে দিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব করতে পারে। এই বিপ্লব নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বপুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগ খতম হয়ে গিয়ে বিশ্বপুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসোন্মুখ, প্রগতিবিরোধী হয়ে পড়েছে, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের বিরোধী হয়ে পড়েছে। তাই সমাজপ্রগতির দ্বার সে রুদ্ধ করছে। প্রযুক্তির বিকাশ ও আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় চরম সংকট দেখা দিচ্ছে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দূর করতে পারছে না। পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং জনসাধারণের উপর দেশের ও দেশের বাইরের পুঁজিপতিদের, অর্থাৎ, দু'দিকের শোষণের ফলে বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির তুলনায় বাজারের সংকোচন ক্রমাগত উৎপাদনে সংকট ডেকে আনছে। আর, এই সংকট ইন দ্য রিভার্স অর্ডার (উল্টো দিক থেকে) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প-দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতি -নৈতিকতার যে বিকাশ ঘটে — সেই প্রক্রিয়ার উপরও প্রভাব ফেলছে, তাকে খর্ব করছে। তাহলে, সমস্ত দিক থেকে পুঁজিবাদ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু এবং প্রগতিবিরোধী। ফলে, তাকে বিপ্লবের আঘাতে হটাতে হবে। এই বিপ্লবে অবশ্যই সর্বহারাশ্রেণী নেতৃত্ব দেবে। তাই বর্তমান আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্তর হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোতে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিকাশের অর্থে যে দেশগুলো বনেদি পুঁজিবাদী দেশগুলোর থেকে পিছিয়ে আছে, যেখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কায়েম রয়েছে, যেখানে

বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক-চাষীর ঐক্য সাধন করে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হবে।

তৃতীয়ত, যেসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই হয়নি, বা যেসব দেশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপনিবেশবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্তরে রয়েছে, সেইসব দেশেও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-চাষী এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের কোনও অংশ যদি সেই লড়াইতে আসতে চায়, আসবার মতন জায়গায় থেকে থাকে, তবে তাদের নিয়ে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু, তাকে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা সর্বহারা বিপ্লবের অংশ ভাবতে হবে এবং অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর, সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সেগুলো পরিচালনা করতে হবে। এভাবে যদি কেউ না ভাবে, তবে তারা ভুল করবে এবং ভুলের মাশুল তাদের দিতে হবে এই অর্থে যে, এই বিপ্লব সফল পরিণতিতে পৌঁছুবে না। কারণ, শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, সেই দেশের বুর্জোয়ারা তার নেতৃত্ব দখল করবে এবং সেই বুর্জোয়ারা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার অংশ হিসাবে বিপ্লবের পথ ও গতি রুদ্ধ করবে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আধ-সেঁকা রুটির মতো ও খণ্ডিতভাবে সমাপ্ত হবে। এর ফলে গণমুক্তি আসবে না, বরং, পুঁজিবাদ সংহত হবে, এমনকী জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরও তা বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। আজ যে নিও-কলোনিয়ালিজম (নয়া-উপনিবেশবাদের) কথা বলা হচ্ছে, লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাতেও তার স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি নিজেই এটা বলে গেছেন। নয়া-উপনিবেশবাদ শব্দটা লেনিন ব্যবহার করেছেন কি করেননি, সেটা আমার কাছে খুব বড় কথা নয়। কিন্তু নয়া-উপনিবেশবাদের মূল বৈশিষ্ট্য বা মূল কথাটা লেনিনেই পাওয়া যাবে যে, এযুগে সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করার মধ্য দিয়ে পিছিয়ে-পড়া স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, এমনকী সামরিক কর্তৃত্ব পর্যন্ত কার্যত নিজেদের অধীনে এনে ফেলবে। সাম্রাজ্যবাদ পুরনো ঢঙে থাকবে না, নতুন ঢঙে আসবে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে। তাই এযুগে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, তবেই সেগুলো সঠিক ও সফল পরিণতিতে পৌঁছবে, সেগুলোকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ, এই সমস্ত দেশের বিপ্লবগুলোকে ক্রমে ক্রমে উত্তরণ ঘটানোর মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নিয়ে যাওয়া যাবে, জাতীয় স্বাধীনতাও পুরোপুরি অর্জিত ও রক্ষিত হতে পারবে।

কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের ও লেনিনের এই শিক্ষাগুলো, বা আরও যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে, সেগুলো তো বইয়েই লেখা আছে, মুখস্থ করে যে কেউ সেগুলো বলতে পারে, বা সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি এগুলো জানে। অনেকেই যাঁরা একটু খোঁজখবর রাখেন, লেনিনের বই পড়েছেন, তাঁরাই এগুলো বলতে পারবেন। এসব জানার দরকার নিশ্চয়ই আছে। প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে এগুলো সকলকে শেখাবার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। এগুলো না জানলে, ইতিহাসের এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু না থাকলে, আজকের বিপ্লবী কর্মীরা মানুষকে কাছে টানবে কী করে? কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি, তাহল, এই শিক্ষাগুলো একটা দেশের কোনও পার্টির নেতা-কর্মীরা খুব ভাল করে বলতে পারছে কি পারছে না, তা দিয়ে সেই পার্টিটা প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি কি না, তাদের মার্কসবাদের উপলব্ধিটা সঠিক কি না, চিন্তা ও তত্ত্বটা ঠিক কি না — এগুলো বিচার হয় না।

আমাদের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে বড় বড় সব পার্টি তৈরি হওয়ার পর কত যুগ পার হয়ে গেল। কত আন্দোলন তাদের নেতৃত্বে হল। কিন্তু, কী হল? তারা বিপ্লব সফল করেছে কি করেনি, বিপ্লবের পথে বেশিদূর এগোতে পেরেছে কি পারেনি — এই প্রশ্ন আমি তুলছি না। বিপ্লব করা যায়নি মানেই বিপ্লবের চিন্তা বা তত্ত্বটা ভুল ছিল, তা প্রমাণিত হয়ে যায় না। কারণ, শুধুমাত্র চিন্তার সঠিকতাই বিপ্লব করে দেয় না। বিপ্লবের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে এগোবার সাধনাই সমাজে একমাত্র শক্তি নয়। সমাজে বিপ্লবের সপক্ষে যেমন শক্তি থাকে, তেমনি বিপ্লবকে রোখবার পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলোও থাকে, যেটা নানাভাবে বিপ্লবকে ক্রমাগত বাধা দেয়। বিপ্লববিরোধী এই পরিবেশ ও শক্তিটা কোন সময়ে কতটা প্রবলভাবে কাজ করছে, সেটা বিচারে রাখতে হয়। বিপ্লবী তত্ত্বের সারবত্তা ঠিক থাকলেই যদি বিপ্লবী মতের পক্ষে হু হু করে সংগঠন বাড়ত, দ্রুত বিপ্লব হয়ে যেত, তাহলে, মার্কসের পক্ষে নিজের হাতেই তাঁর দেশে বিপ্লব করে যাওয়া সম্ভব ছিল। তাহলে, কোনও বড় বিপ্লবীর জীবনে সঠিক তত্ত্ব ও পদ্ধতিতে সংগ্রাম করা সত্ত্বেও পরাজয় বরণ করার প্রশ্ন ইতিহাসে দেখা দিত না। এগুলো ছেলেভুলোনো কথা। যাঁরা তত্ত্বটাকে ঠিক উপলব্ধি করেন তাঁরা জানেন যে, বিপ্লবের

তত্ত্ব সঠিক ও নির্ভুল হলেও বিপ্লবের অগ্রগতি দ্রুত হবে কি মন্থর হবে, শুধু তত্ত্বের উপর তা নির্ভর করে না।

ফলে, আমার প্রশ্ন এ জায়গায় নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে উপলব্ধির ভিত্তিতে তারা সব বড় বড় পার্টি গঠন করে ফেলল, তাদের সেই উপলব্ধি ও তাদের পার্টির গঠন প্রক্রিয়াটা কি লেনিনবাদসম্মত? ভারতের বিশেষ পরিস্থিতির যে ব্যাখ্যা তারা রেখেছে এবং তার ভিত্তিতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করেছে, সেটা কি যথার্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত? এইটাই মূল প্রশ্ন। এগুলো সঠিক থেকেও যদি তাদের পক্ষে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হত, তাহলে বোঝা যেত, তাদের তত্ত্ব ও রাস্তাটা ঠিকই আছে, কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশ আটকাচ্ছে। তখন সেই বিরুদ্ধ পরিবেশের বিরুদ্ধে কীভাবে কতটা সংগ্রাম করে বিপ্লবী আন্দোলনের গতিবেগটা বাড়ানো যায়, সেটাই হত মূল প্রশ্ন। কিন্তু এখানে তো তা নয়।

সি পি আই, সি পি আই(এম) এবং সি পি আই (এম-এল)-এর মতো দলগুলো আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের স্বীকৃতি নিয়ে ও তার সঙ্গে সাম্যবাদী আন্দোলনের যে বিশ্বজোড়া গৌরব তৈরি হয়েছিল, তাকে পুঁজি করে এদেশে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি যে স্বাভাবিক দুর্নিবার আকর্ষণের কথা আমি আগেই বলেছি, তার ফলেই এইসব দলগুলোর নেতাদের মুখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা শুনে দলে দলে মানুষ তাদের পিছনে জড়ো হয়েছে। আবার দেখবেন, পার্টির আকারটা বড় হয়ে গেলে, তাকে ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে একটা মানসিকতা গড়ে ওঠে। পার্টিটার নেতৃত্ব সঠিক হোক, বেঠিক হোক, তার প্রভাবে প্রভাবিত মানুষগুলো শুধু পার্টিটা বড় বলেই নাচতে থাকে। তাদের মানসিক গঠন ও চিন্তা প্রক্রিয়াটা একটা ভিন্ন ধরনের হয়ে যায়। আর কোনও কিছু তারা বিচার করতে চায় না। লড়ে প্রাণ পর্যন্ত দেয়, তবু বিচার-বিশ্লেষণে আসতে চায় না। আবার, যদি কখনও বিচার-বিশ্লেষণে আসেও, তবে সেটাও হয়ে দাঁড়ায় মনগড়া বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি। কারণ, যে পার্টিটার রাজনীতির দ্বারা তারা প্রভাবিত, সেই পার্টিটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যে চিন্তাপ্রক্রিয়া, যে বিচারপদ্ধতি নিয়ে চলে, সেটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাপ্রক্রিয়া বা বিচারপদ্ধতিই নয়। ফলে, এসব দলের কর্মীদের এবং এদের রাজনীতির প্রভাবে প্রভাবিত মানুষগুলোর চিন্তা ও বিচারের পদ্ধতি অ-মার্কসবাদী হওয়ার জন্য যে সিদ্ধান্তগুলো তারা করে, সেগুলো সমাজ পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রেক্ষাপটে হয়ে দাঁড়ায় মনগড়া। এরাই পরে যখন দেখে কিছুই হল না, তখন হতাশ হয়, আন্দোলন থেকেই সাময়িকভাবে হলেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

তাই যে কথা বলছিলাম, তত্ত্ব সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাস্তবায়িত করার মতো উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তি পারিপার্শ্বিক নানা কারণে যদি অর্জন করা না যায়, তবে বিপ্লব হবে না। আবার, একটা দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বুলি আউড়ে সুবিধাজনক পরিস্থিতি পেয়ে যদি ভাল শক্তি অর্জন করেও ফেলে, বড় পার্টি হয়ে যায়, বহু লোক তার পিছনে জড়ো হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও সেই দলের তত্ত্বটা যদি ভুল হয়, চিন্তাপ্রক্রিয়া ভুল হয়, বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ভুল হয়, তাহলে শুধু তারা শক্তির জোরে বিপ্লব করে দেবে, তা হয় না। বিষয়টা এত সোজা নয়।

সুতরাং, দলের নেতৃত্বের বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি, নেতা-কর্মীদের চিন্তাপ্রক্রিয়া এবং ঐ দলের প্রভাবে প্রভাবিত মানুষগুলোর চিন্তাপদ্ধতির যে কথা আমি বললাম, মনে রাখবেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান কথাটার মানে হচ্ছে, সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপ্রক্রিয়া। এটা আয়ত্ত করার ব্যাপারটা শুধুমাত্র একজন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না, বরং একজন মানুষের বুদ্ধি কীভাবে প্যাটার্নড হবে, অর্থাৎ কোন ধাঁচায় গড়ে উঠবে, সেটা নির্ভর করে সেই বিশেষ মানুষটির চিন্তাপ্রক্রিয়ার উপর। যেমন, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের দৃষ্টান্তই ধরুন। যাঁরা ট্রটস্কি, বুখারিন বা তাঁদের শিবিরের অন্যান্যদের মতাবলম্বী ছিলেন, অথবা, পরবর্তীকালে যাঁরা ক্রুশ্চেভের কট্টর সমর্থক ছিলেন, তাঁরা অতি সহজেই বিশ্বাস করেছেন ও জোর গলায় বলেছেন যে, স্ট্যালিন সোভিয়েট ইউনিয়নের অপরিমেয় ক্ষতি করে গেছেন। এমন কথাও তাঁরা বলেছেন যে, স্ট্যালিনের মতো 'ধুরন্ধর শয়তান' আর হয় না। অন্যদিকে, যাঁরা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামী ছিলেন, লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে যাঁদের দ্বিধাহীন আস্থা ও আনুগত্য ছিল, তাঁদের ট্রটস্কির ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে, অথবা ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে আধুনিক শোধনবাদীরা সমাজতন্ত্রের যে অপরিমেয় ক্ষতি করেছে, সে বিষয়ে বিশ্বাস ছিল সমস্ত তর্কের ঊর্ধ্বে। অথচ দেখুন, এই দুই শিবিরের লোকেরাই দাবি করেন যে, তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস

করেন। তাহলে, আপনারা দেখছেন, উভয়পক্ষই নিজেদের সাম্যবাদী বলছেন, সাধারণভাবে উভয়েই সাম্যবাদী আন্দোলনের পরিমন্ডলের মধ্যে আছেন, তবুও এত গুরুত্বপূর্ণ বা একটা মূল বিষয়ের উপর উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত একেবারে বিপরীত। এরকম কেন হচ্ছে?

আমাদের দেশেও দেখবেন, সি পি আই, সি পি আই(এম) বা অন্যান্য দলের এমন বহু নেতা কর্মী আছেন, যাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর রাজনীতি যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনে ভাঙন ঘটাচ্ছে এবং কংগ্রেসের সুবিধা করে দিচ্ছে। আবার, উল্টোদিকে আমাদের দলে একেবারে সাধারণ স্তরে এমন বহু কর্মী আছেন, যাঁদের অন্য কোনও দলের নেতা কোনমতেই এস ইউ সি আই দলের সত্যিকারের বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কিত ধারণাকে গুলিয়ে দিতে পারবেন না।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, চিন্তাপ্রক্রিয়া এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতার সীমাটা এই জায়গায়। ব্যক্তির জিনিয়াস বা ট্যালেন্ট (প্রতিভা) যাই বলুন, কোনও কিছুই সীমাহীনভাবে স্বাধীন নয়, যেমন খুশি তিনি চলেনও না, চলতে পারেনও না। প্রত্যেকেই ভাবেন যে, তিনি খুব স্বাধীনভাবে মুক্তমনে চিন্তা করছেন। একথা ঠিক যে, মানুষের মনের একটা স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা সীমাহীন নয়, তা আপেক্ষিক। মনের স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে। সেই সীমাটা দুটো জায়গায়। একটা হচ্ছে বাস্তব পরিবেশ, আর একটা হচ্ছে চিন্তাপ্রক্রিয়া। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির ভিতরে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার অজান্তে বা জানিতভাবে তার চিন্তাপদ্ধতি গড়ে উঠেছে, সেই প্রক্রিয়াটির দ্বারা তার মনের বা চিন্তার স্বাধীনতা সীমায়িত। তাই আমরা একেক জন একেক রকমভাবে মার্কসবাদ বুঝছি, লেনিনবাদ বুঝছি এবং তা ব্যক্ত করছি। সমাজে অনেক ব্যক্তি যাঁরা মার্কসবাদকে সঠিক বলে মনে করেন, তাঁরাও মার্কসবাদকে বলছেন তাঁদের মতন করে। অনেকেই মনে করেন, মার্কসবাদের সমস্ত বই তিনি পড়েছেন, তিনি সব জানেন। মার্কসবাদ জানার তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। সুতরাং, তাঁর বোঝায়ও কোনও গণ্ডগোল হয়নি। এভাবে যাঁরা ভাবেন, দেখা যাবে, মার্কসবাদ নিয়ে তাঁদের মধ্যে পরস্পর আলোচনায় হয়তো কোনও পয়েন্টে কোথাও দু-লাইনের ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে ঐক্য হচ্ছে, কিন্তু, তারপর তিন লাইনে গিয়ে বলে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য হবে না। অথচ সবাই মনে করছেন, তাঁরা সব জানেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কারওর মনে করাটা এখানে আসল নয়, তা দিয়ে সমস্যার মূল জায়গাটা ধরা যাবে না। এখানেই প্রশ্ন আসে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধির।

এখন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধি কথাটার মানে কী? এই 'প্রকৃত' বলতে আমরা কী বুঝি? যুক্তিসম্মত আলোচনায় পাওয়া যাবে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধি কথাটার যথার্থ মানে হচ্ছে, সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বিচারপদ্ধতি, অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি। এই সঠিক বিচারপদ্ধতি বাদ দিয়ে কোনও একটা বিষয়ে আলোচনায় যদি মনে হয়, এটাই 'প্রকৃত' এবং তাকে কেন্দ্র করে ঐক্যও হয়, তবে তাতে লাভ হয় না। আজ যেটা মনে হল প্রকৃত, কালই আবার একটা ঘটনায় দেখা যাবে, সমস্তটাই গোলমাল হয়ে গেল। এতে যেটা হয়, তা হচ্ছে সাময়িক ঐক্য। এর নামই হল সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছানো। কিন্তু এ ঘটনা তো দুটো সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ চিন্তাপদ্ধতির লোকের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। তারাও তো অনেক সময় অনেক ইস্যুতে আপাতদৃষ্টিতে উপর উপর সাধারণ ঐক্যে আসে। একেবারে দুই বিপরীত মেরুর দর্শনের ব্যক্তিরাও একটা সাধারণ ইস্যুর উপর একটা মোটামুটি বিচারধারায় ঐক্যবদ্ধ হয়, একত্রে কাজ করে। না হলে, বিভিন্ন দল ও শক্তির যুক্তফ্রন্ট হয় কী করে? এইভাবে কোনও একটা সাধারণ ইস্যুর উপর ঐক্য করাটাই তো যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির মূল কথা। কিন্তু, এই মাপকাঠিতে তো একটা পার্টি প্রকৃতই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি কিনা, তার বিচার হয় না। একটা পার্টি প্রকৃতই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি কিনা, তার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধিটা সঠিক কিনা, তা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে সেই পার্টির বিচারপদ্ধতি কী, চিন্তাপ্রক্রিয়া কীরকম, অর্থাৎ সেটা সঠিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত বিচারপদ্ধতি এবং চিন্তাপ্রক্রিয়া কি না, সেইটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। অথচ এই ব্যাপারটা আমাদের দেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনে পরিষ্কার হয়নি। আমাদের দেশে প্রথমে সি পি আই, তারপর তা ভেঙে সি পি আই(এম), সেটাও ভেঙে পরে সি পি আই(এমএল) হল। অবশ্য, সি পি আই(এমএল) দ্রুত ভেঙে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সি পি আই এবং সি পি আই(এম) এই যে একই পার্টি ভেঙে দুটো পার্টি আমাদের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নাম নিয়ে দাঁড়াল, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের স্বীকৃতি ও গৌরবকে ভিত্তি করে বড় পার্টি হয়ে গেল, তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে উপলব্ধি কী? এই আসল জায়গাটাই কেউ বিচার করে পরিষ্কার করে নিতে চায় না। তাদের রাজনৈতিক প্রস্তাব

ও সিদ্ধান্তগুলো বিচার করতে গিয়েও আমরা প্রতিপদেই দেখছি যে, ছোটখাটো দু'চারটে বিষয় ছাড়া মূল বক্তব্য, রাজনৈতিক বক্তব্য তাদের আগাগোড়াই ভুল। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিপ্লবের স্তর, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি যে কোনও মূল বিষয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, এ সম্পর্কে সি পি আই, সি পি আই(এম)-এর বক্তব্য, বিশ্লেষণ, তত্ত্ব সবই ভুল।

কিন্তু আমি এর চেয়েও আর একটা মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে কেবল বিপ্লবের স্তর নির্ধারণটা সাধারণভাবে সঠিক হওয়াই বোঝায় না। যদিও বিপ্লবের স্তরটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে যে দলকে জনগণের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হয়, জনগণকে সংগঠিত করতে হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে টেনে আনতে হয়, তার কাছে রাষ্ট্রের চরিত্র কী, বিপ্লবের স্তর কী, কোন শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে কোন কোন শ্রেণী মিলে উচ্ছেদ করবে — এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত জরুরি, এগুলো অন্যতম মূল বিষয়। এগুলো ছাড়া একটা রাজনৈতিক আন্দোলন দাঁড়াতেই পারে না। এগুলো হল একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনে বিপ্লবী তত্ত্বের বিশেষীকৃত রূপ। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, এই জায়গায় যদি দুটো রাজনৈতিক দলের মিল হয়ে যায়, তাহলেই কি বলা যাবে, তত্ত্বের মিল হয়ে গেল? অনেকে বলবেন, মিল হল। আমি মনে করি, না। শুধু এই দিয়ে মিল হয় না। যেমন, আমরা এস ইউ সি আই বলি যে, ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী দেশ এবং এখানে বিপ্লবটা হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই কথাটা আমাদের দেশে আর এস পি বলে, ওয়ার্কার্স পার্টি বলে, আর সি পি আই-ও বলে থাকে। এমন ব্যক্তিও দেশে পাওয়া যাবে, তত্ত্ব বোঝেন বলে যাঁদের অহমিকা আছে, তাঁদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরাও বলে দেবেন, ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, এখানে ক্ষমতায় আছে বুর্জোয়াশ্রেণী, তাদের উচ্ছেদ করবে শ্রমিক-চাষী-নিম্নমধ্যবিত্ত, নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা, বিপ্লবটা এখানে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ব্যস, তাহলেই কি এসব দল ও ব্যক্তির সাথে এস ইউ সি আই-এর মূল বক্তব্য মিলে গেল, তত্ত্ব মিলে গেল, একথা বলা যায়? না, বলা যায় না। এই মিল আছে কিনা দেখতে গেলে দেখতে হবে, প্রত্যেকের বিচারপদ্ধতি, চিন্তাপ্রক্রিয়া, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মূল নীতিগুলোর সর্বব্যাপক ক্ষেত্রে উপলব্ধি, যৌথ চিন্তা বা যৌথ নেতৃত্ব এবং তার বিশেষীকৃত প্রকাশ — এইসব মূলগত বিষয়ে চিন্তাগত ভিত্তি এক কিনা, অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে ধ্যানধারণাগুলো মূল যে চিন্তাগত ভিত্তি থেকে জন্ম নিচ্ছে, সেই ভিত্তিটা এক কিনা।

এখন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই যে প্রকৃত উপলব্ধি, অর্থাৎ সঠিক মেথডলজি (বিচারপদ্ধতি), এটা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বই মুখস্থ করে আয়ত্ত করা যায় না। রাশিয়াতেও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মার্কস-এঙ্গেলসের কোটেশন আউড়ে রাশিয়ার সমাজ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাশিয়ার বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁরাও মুখে বলেছিলেন, মার্কসবাদ একটা ডগমা (সূত্রবাদ) নয়, কিন্তু বাস্তব বক্তব্যে ও কার্যকলাপে তাঁরা তাকে সূত্রবাদেই পরিণত করেছিলেন। মার্কস তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছিলেন যে, সর্বহারা বিপ্লব প্রথমে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তখনকার উদারনৈতিক পরিবেশ দেখে মার্কস এমন কথাও বলেছিলেন যে, ঐসব দেশে বিপ্লব শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে। রাশিয়াতে অনেক মার্কসবাদী পণ্ডিত মার্কসের ঐ কথাগুলো আউড়ে বিপ্লব বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে লেনিনকে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। লেনিন বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগের সঙ্গে মার্কসের যুগের পার্থক্য কী, এবং সেই পার্থক্য অনুযায়ী কেন এযুগে বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর বদলে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের সবচেয়ে দুর্বল স্থানগুলিতে এসে যাবে এবং সেখানেই বিপ্লব হবে, তা দেখালেন। লেনিন তত্ত্বগতভাবে এও দেখালেন যে, আজকের যুগে বুর্জোয়ারা যখন গণতন্ত্রের চেয়ে সামরিকবাদ ও আমলাতন্ত্রের দিকেই বেশি ঝুঁকেছে, তখন প্রতিটি দেশে বিপ্লব সশস্ত্র হতে বাধ্য। এসব বিষয় ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও রূপ, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন, তার গণতন্ত্রের ধারণা, সর্বহারা একনায়কত্ব, সর্বহারা বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা চাষীর ভূমিকা, ইত্যাদি নানা মূল বিষয়ে প্লেখানভ, ট্রটস্কি, কাউট্স্কি ও অন্যান্যদের সঙ্গে লেনিনের তীব্র বিতর্ক হয়। এই বিতর্ক কেন হল? সকলেরই তো মার্কস-এঙ্গেলস-এর বইগুলো কণ্ঠস্থ ছিল, তাহলে বিতর্ক হল কেন? কারণ, একদল কেবল মার্কস-এঙ্গেলসের বাণীগুলোকে, সিদ্ধান্তগুলোকেই তত্ত্ব বলে ধরে নিয়েছেন। আর, লেনিন মার্কসবাদের তত্ত্ব বলতে মার্কস-এঙ্গেলসের কথাগুলো, বা তাঁদের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্তগুলো তাঁরা করেছিলেন, শুধু সেগুলোকে মনে করেননি। তিনি ধরেছেন — যে

বিজ্ঞানটাকে, যে বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করে মার্কস একটা সময়ে সিদ্ধান্তগুলো করেছিলেন, সেই বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটাই হল মার্কসবাদ। যেমন, মার্কস নিজে ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেখে সর্বহারা বিপ্লব গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ পথে হবে বলে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, প্যারি কমিউনের ঘটনার পর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস তাঁর একই বক্তব্যের উপর নিজেই 'গোথা প্রোগ্রামে' সংশোধনী এনেছিলেন। দু'য়ের মধ্যে সময়েরও খুব পার্থক্য ছিল না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আগ্রাসী রূপটা না দেখে মার্কস একরকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন, পরে প্যারি কমিউন তাঁকে শুধরে দিয়েছে। আজও যাঁরা মার্কসের কোনও কথা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এই কথাটা মার্কস বলেছিলেন, যা ইতিহাসে ফলেনি, ঐ কথাটা ফলেছে, তাঁরা কি মার্কসবাদী? তাঁরা মার্কসবাদ বোঝেনইনি। লেনিন ঠিকই ধরেছিলেন যে, এগুলো মার্কসবাদ নয়, এভাবে মার্কসবাদ বোঝা যাবে না, তাকে প্রয়োগ করা যাবে না।

একইভাবে লেনিন কোথায় কী বলেছেন, তা লেনিনবাদ নয়। লেনিন যে বিজ্ঞানটিকে প্রয়োগ করলেন, যে কায়দায় যেভাবে করলেন এবং তা করতে গিয়ে আবার ঐ বিজ্ঞানকে, ঐ বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে তিনি যতটা উন্নত করলেন এবং তার ভিত্তিতে একটা বিশেষ অবস্থায় যে মূল নীতিগুলো নির্ধারণ করলেন, সেই মূল নীতিগুলো হল মূল বুনিয়াদ, আর সেই বিচারবিশ্লেষণ পদ্ধতিটি হল লেনিনবাদ। সেটি আয়ত্ত করতে না পারলে, শুধু লেনিনের কথাগুলো মুখস্থ করে আওড়ালে কিছুই হবে না, শুধু নকলনবিশি করা হবে। তাই লেনিনের সময় পার্টি গঠন, আর আজকের সময়ে ভারতবর্ষের জমিতে পার্টি গঠনের পদ্ধতি হুবহু এক হতে পারে না — বিশেষ করে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আজ যে রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে, তা লেনিনের সময় এই রূপ নিয়ে ছিল না।

আজকের সমাজে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটানোটা প্রধান সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়ে নেই। পুরোপুরি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার বিপ্লবের স্তরে, ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে ব্যক্তিসত্তাকে উদ্দীপ্ত করাটাই প্রয়োজন হিসাবে থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া শাসন যেখানে কয়েক যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে বুর্জোয়ারা পিছিয়ে-পড়া বা অগ্রসর যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই হোক এক ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান চালু করার চেষ্টা করেছে, সেই সমাজটা যেহেতু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়ে গেছে, সেহেতু সেটা যদি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে-পড়াও হয়, তবুও সেই পিছিয়ে-পড়া বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজের মতন একই লক্ষণগুলো জন্ম নেবে। এইসব পিছিয়ে-পড়া বুর্জোয়া সমাজেও ব্যক্তিবাদ আজ অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজগুলোর মতো একটা সুবিধায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আজ ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাধীনতার কথাটা যেমন করে ভাবে, বিচার করে, অধিকারটা দাবি করে, সেই অধিকারটা আজ আর লড়াই করে আদায় করার জায়গায় নেই।

বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করার বিষয়টা ছিল — স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, সামন্তী বাঁধনের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় কুসংস্কার-কুআচারের বিরুদ্ধে, পরদেশ দখলদারীর বিরুদ্ধে লড়ে কিছু অর্জন করার বিষয়। সেদিন এই ব্যক্তির অধিকারের লড়াইটা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতিনৈতিকতার ধারণার উপর সমাজপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের পরিপূরকই ছিল। তাই সামাজিক আন্দোলনে ব্যক্তিবাদ সেদিন তেমন কোনও ঝামেলার সৃষ্টি করেনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, দেশাত্মবোধক আন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যক্তিসত্তাগুলো সামনে এসে প্রবল ঝঞ্ঝাট তৈরি করেনি। কিছু কিছু হয়তো করেছে, তবুও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার প্রশ্নে তা সামগ্রিকভাবে বাধা ছিল না, ব্যক্তি-ব্যক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যেই ঐ ব্যক্তিবাদ মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, একটা প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেমন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের মতো দেশ — এইসব দেশে ব্যক্তিবাদ যে রূপ নিয়েছে, এমনকী ভারতবর্ষেও তার খানিকটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আজকে এইসব দেশে একটা বিপ্লবের স্লোগান নয়, সেইমতো কোনও দায়দায়িত্ব তার নেই। তা অধিকার অর্জনের হাতিয়ারের বদলে একটা প্রিভিলেজ-এ (সুবিধায়) অধঃপতিত হয়েছে, যাকে বলা হয় নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিবাদ। সমাজ পরিবেশে এই নোংরা ব্যক্তিবাদের প্রভাব সমাজ অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কাজ করছে। এমন একটা পরিবেশ থেকে একটা দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বা তার কর্মকাণ্ড বা আন্দোলনও বিচ্ছিন্ন নয়।

ভারতবর্ষে দিন যত এগোচ্ছে, ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের স্থায়িত্ব যত বাড়ছে, বুর্জোয়া সমাজের

প্রতিক্রিয়ার দিক যত প্রকট হচ্ছে, ততই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাব সমাজের মধ্যে সুবিধাবাদের আকারে দেখা দিচ্ছে বেশি। রাশিয়ার বিপ্লব বা চীনের বিপ্লব ঠিক আজকের মতো করে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়নি, ফলে তারা তা অনুভব করেনি। চীনের বিপ্লবটাই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, যেখানে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের সঙ্গে ছিল। রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা স্তর পর্যন্ত বুর্জোয়ারা এগিয়েছে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে থেকেছে। তারপর বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় বসে বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনকে স্থায়িত্ব দেওয়ার আগেই সর্বহারাশ্রেণী দ্রুত বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেছে। এরপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই কারণে সেখানে তখন ব্যক্তিবাদের একটা আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। আর, এখানে ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শাসন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। এ যদি না হত, আমরা যদি ১৯৩০ সালের মধ্যে, '৪৭ সালের মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্ব শেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে ফেলতে পারতাম, তাহলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী বুর্জোয়া সমাজ পরিবেশের মধ্যে প্রকট বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের ব্যাপারটাকে পার্টি গঠন করার সময় এত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ রাখবার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু আমাদের এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ রাখার প্রয়োজন হয়েছে। কারণ, ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা স্বল্পকালের জন্য হয়নি, স্বল্পমেয়াদী হয়নি। এই অবস্থায় আমরা ভুলতে পারি না যে, এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের ব্যাপারটা লক্ষ রেখে না এগোলে, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হবে। যত কষ্টকর হোক, এ জিনিস লক্ষ রেখে আমাদের এগোতে হবে, একে ঠিক জায়গায় ধরিয়ে দিতে হবে। পার্টির মধ্যে তর্কবিতর্ক, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা, আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সমস্ত কিছুকে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদ কীভাবে কোথায় কীরূপে মাথা তোলে, কীভাবে তার দ্বারা ব্যক্তি কলুষিত হয়, দলের সর্বহারা গণতন্ত্রের পরিবেশ নষ্ট হয়, তা ধরিয়ে দিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে যে, ব্যক্তিবাদ সর্বহারা গণতন্ত্রকে সুবিধায় পর্যবসিত করে। সর্বহারা গণতন্ত্র আলাদা করে কোনও ব্যক্তির সুবিধা পাওয়ার জন্য বা কোনও ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য নয় — তা সমস্ত ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে কাজ করতে শেখাবার জন্য। সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক আন্দোলনের স্বার্থে ব্যক্তিসত্তার প্রভাব ও আক্রমণ থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে মুক্ত ও রক্ষা করার জন্যই সর্বহারা গণতন্ত্র। এভাবে না বুঝলে আজকের দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের চলবে না।

ব্যক্তিবাদের প্রভাব রাশিয়ার পার্টিতেও খানিকটা ছিল, কিন্তু আজকের বুর্জোয়া সমাজের মতো সেটা এতটা নোংরা রূপ নেয়নি। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও ব্যক্তিবাদ ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পটভূমিতে তখনও ব্যক্তিবাদ সুবিধায় পরিণত হয়নি। তখনও ব্যক্তিস্বাধীনতার স্লোগান ছিল একটা সংগ্রাম। কিন্তু, আজ তা পুরোপুরি সুবিধাবাদে পরিণত হয়েছে এবং তার প্রভাব সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষদের উপর, যুব সম্প্রদায়ের উপর, এমনকী সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর পর্যন্ত বর্তাচ্ছে। এ জিনিস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে এমনভাবে বর্তমান রূপ নিয়ে ছিল না। পুঁজিবাদের আয়ু যত বাড়ছে, তত ব্যক্তিবাদ নোংরা রূপ নিচ্ছে। আরও বিশ-তিরিশ বছর বাদে একটা পুঁজিবাদী দেশে একটা কমিউনিস্ট পার্টি ব্যক্তিবাদকে আরও যে রকম নোংরাভাবে প্রকাশিত হতে দেখবে, আজ তাও দেখছে না। এই দিকটা লক্ষ রেখেই একটা কমিউনিস্ট পার্টিকে তার সাংগঠনিক সমস্যার কথা ভাবতে হবে। কীভাবে এই সমস্যার সে সমাধান করবে, তা ভাবতে হবে। একাজ করতে হলে লেনিনবাদের শিক্ষা থেকে এবং সেই শিক্ষাকে খানিকটা পরিবর্ধিত করে, তার প্রকৃত তাৎপর্য ঠিক বুঝে নিজের দেশে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারা চাই। একাজ লেনিনের বই বা বাণীগুলো মুখস্থ করে হবে না। ওভাবে যাঁরা লেনিনবাদকে বোঝেন, তাঁরা মনে করতে পারেন, লেনিন তো এভাবে বলে যাননি; আর তা যখন বলে যাননি, তখন আমাদের এভাবে বোঝার দরকার নেই। মনে করতে পারেন, এভাবে না বুঝে যদি লেনিনের পার্টি বিপ্লব করতে পেরে থাকে, তবে ভারতবর্ষে কেন বিপ্লব হতে পারবে না? এরকম করে বিপ্লব বুঝলে, যেভাবে সি পি আই, সি পি আই (এম) নষ্ট হয়েছে, আমাদেরও তাই হবে। আমার একথার মানে আবার এরকম নয় যে, এ সম্পর্কে আমাদের কনসেপশন বা তত্ত্বটা ঠিক হওয়া নিয়েই কথা। অর্থাৎ, ওটা যখন সঠিক আছে, তখন আর আমাদের মধ্যে বেঠিক কিছু নেই, আমাদের মধ্যে দোষ নেই, ভুল নেই, আমরা যা করছি, সবই ঠিক। আমি মনে করি, এগুলো সবই আমাদের মধ্যে খুবই আছে। কিন্তু, আবার এগুলো

আছে বলেই, ঐ তত্ত্ব বা কনসেপশনটা ভুল হয়ে যায় না, এবং এইসব দোষত্রুটি দেখিয়ে ঐ তত্ত্বটার বিরুদ্ধে লড়াই করার মানে হয় না। এই দোষগুলো দূর করবার রীতিও ওটা নয়। তার রীতিটা হল, ঐ তত্ত্বকে ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে ও বোঝাতে সক্ষম হওয়া। তবেই আমরা দোষত্রুটি, ভুলের বিরুদ্ধে সঠিক পথে সংগ্রাম করতে পারব। তাহলে বুঝতে পারছেন যে, ভারতের মাটিতে একটা সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠন করতে পারার কাজটা শুধুমাত্র এদেশের বিপ্লবের স্তরটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারার উপর নির্ভর করে নেই। নাহলে, লেনিনীয় পার্টি গঠনের জন্য বইয়ে কী কী নীতি ও সাংবিধানিক রীতি অনুসরণ করার কথা বলা আছে, সেসব তো আমাদের দেশের নামডাকওয়ালা তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর নেতারা ভালই জানতেন। কিন্তু তার দ্বারা কি ঐসব পার্টিগুলো সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছে? বরং নেতারা সব নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদের এক-একজন প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এসব জিনিস শুধু বাইরের আচার-আচরণ দিয়ে বোঝা যাবে না। বাইরে অনেকে খুবই বিনয়ী, ভদ্র, আপাতদৃষ্টিতে দেখলে খুবই সরল, সাধাসিধে জীবনযাপন করেন, নিজেরা জামা-কাপড় কাচেন, ঘর ঝাঁট দেন, নিজেরা অফিসের ফাইল তৈরি করেন। এভাবেই এঁরা আত্মশুদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন, এখানেই তাঁদের বিশুদ্ধতা! কিন্তু, মনে তাঁদের পোকা ধরেছে, সেখানে সব পঙ্কিলতায় ডুবে গেছেন — হীনতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষুদ্রতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, হামবড়াভাব — এসব যত বদ দোষ ব্যক্তিচরিত্রের আছে, সব কিছু তাঁদের চরিত্রে ঢুকে গেছে। শুধু তাঁরা পবিত্রতা রক্ষা করেছেন হাঁটুর ওপর কাপড় পরা, আর না-খাওয়ার মধ্যে। এটা ভন্ডামি, মার্কসবাদ নয়। আর যাঁরা সৎ তাঁদের ক্ষেত্রে এটা একধরনের ম্যাসোচিজম (মর্ষকামিতা)। এসব ফাঁকির রাস্তায় কি ব্যক্তিবাদকে দূর করা যায়? বরং, এসব রাস্তায় ব্যক্তিবাদের অহমে আরও তেল মালিশ করা হয়। মার্কসবাদীদের আত্মশুদ্ধির রাস্তা এটা নয়। আসলে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের লক্ষ্য থেকে তাঁরা এসব আচার-আচরণ করেন। দর্শন না বুঝলে এ জিনিসের প্রকৃতিই বোঝা যাবে না। এই ধরনের সস্তা জনপ্রিয় আচার-আচরণ মানুষকে ঠকায় বেশি। এগুলো সেই ব্যক্তিরই দরকার হয় যে দুর্বল, জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য যার কাছে এইসব পপুলিস্ট আচার-আচরণই একমাত্র সম্বল। খুঁটিয়ে বিচার করলে ধরা পড়বে যে, এগুলো আমলাতান্ত্রিকতারই উল্টো রূপ। আমলাতান্ত্রিকতা মানে কি সবসময় শাসিয়ে চাবুক উঁচু করে থাকা নাকি? মিষ্টি কথা কি ঝানু আমলারা বলে না? যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, যাঁরা জেলে গেছেন, বা সরকারি ঝানু আমলাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা দেখেছেন, আমলাদের মতন অমন চিনি আর কারওর কথায় ঝরে না। তাই বলছিলাম, এসব বাইরের সরল আচরণ, মিষ্টি কথা দিয়ে কিছু হবে না।

তার মানে আমি বিলাস বা আরাম-আয়েসের জীবনযাপন করার কথা বলছি না। সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। একজন মার্কসবাদীর মানসিকতাটা হবে, তিনি বিপ্লব ও পার্টির প্রয়োজনে যে কোনও ধরনের কষ্ট হাসিমুখে ও স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে পারেন। এ নিয়ে তাঁর মধ্যে লোককে দেখানো বা ভান করার প্রবণতা থাকবে কেন? পার্টির কোনও কর্মী বা সমর্থক যার হয়তো সামর্থ্য আছে, তিনি যদি কোনও নেতাকে ভাল জামা বা একজোড়া জুতো দেন, তবে সেই নেতা তা ব্যবহার না করে লুকিয়ে রাখবেন কেন? তিনি তা পরবেন, ব্যবহার করবেন। তাই বলে এসব জিনিসের প্রতি তিনি কখনই আসক্ত হয়ে পড়বেন না। কিন্তু আমি দেখছি, আমাদের পার্টির নেতাদের মধ্যেও কেউ কেউ ভাল থাকা-খাওয়া-পরা এসবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছেন, ওসব না হলে তাঁরা দৈনন্দিন বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতেই কষ্ট বোধ করছেন, সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের বিরাগ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোও হচ্ছে ঐ বুর্জোয়া নোংরা ব্যক্তিবাদী সংস্কৃতিরই আর একটা রূপ। আমি যেটা বলতে চাইছি, তাহল, আত্মশুদ্ধির কোনও সোজা রাস্তা মার্কসবাদীরা বাতলায়নি। মার্কসবাদীদের, বিপ্লবী কমিউনিস্টদের আত্মশুদ্ধির রাস্তা হল নিজেকে সমস্ত রকম নীচতা, ক্ষুদ্রতা, কূপমণ্ডুকতা, হীন স্বার্থপরতা, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা থেকে শুরু করে জীবনের সকল বিষয়ে ব্যক্তিসম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত করা।

এখন, রাশিয়ার পার্টি, চীনের পার্টি যেরূপে ব্যক্তিবাদকে পেয়েছে ও যে পদ্ধতিতে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, আমাদের দেশে আজ সেই একই রকম পদ্ধতিতে, পার্টির একই রকম কনস্টিটিউশনাল ফর্মালিটিজ (সাংবিধানিক রীতি-বিধান) দিয়ে কাজ হবে নাকি? সেটা নকল করতে গেলে আমরা এগোতে পারব না, সমস্যার সঠিক সমাধানও করতে পারব না। এখানেই লেনিনবাদকে, তার মূল নীতিগুলোকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করে নিজের দেশের ইতিহাস, সমাজ ও বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে প্রয়োগ করতে

পারার জরুরি আবশ্যকতা।

শ্রমিকশ্রেণীর দল ও নেতৃত্বের বিষয়টিকে লেনিন পরিষ্কার করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং এর অপরিহার্যতার কথা বারবার বলেছেন। তিনি একথা বলেননি যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে মানলেই একটা দল বিপ্লব করতে পারবে। উল্টে তিনি বলেছেন, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। এই তত্ত্ব বলতে গিয়ে তিনি যৌথ জ্ঞান, দলের নেতৃত্বের সর্বাত্মক জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন, শুধু একটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বকে বোঝাননি। কারণ, তার দ্বারা সমাজের গুরুতর সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে ট্যাকল করা, মোকাবিলা করা যায় না। নানা সমস্যার চরিত্র ও তার উৎপত্তির মূল জায়গাটা ঠিকমতো জানতে হলে, নেতৃত্বের জ্ঞানটা সর্বাত্মক হওয়া চাই। লেনিনবাদের আর একটা মূল সিদ্ধান্ত আছে মার্কসবাদের মূল নীতিগুলোর উপলব্ধি সম্পর্কে। সেটা হচ্ছে, মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিন যে মূল নীতিগুলো নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন, সেগুলো যে যুগে যে মূল পরিস্থিতির উপর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে নির্ধারিত হয়েছে, সেই যুগ ও মূল পরিস্থিতিটা বিশ্বে শ্রেণী সমাবেশের দিক থেকে যতক্ষণ মূলগতভাবে এক থাকবে, ততক্ষণ সেগুলো মূলনীতি হিসাবে থাকবে। কিন্তু এই মূল নীতিগুলোর উপলব্ধি এক জায়গায় থাকবে না। যেহেতু বাস্তব পরিস্থিতি ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে, গুণগত পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগলেও পরিমাণগত পরিবর্তন প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকে, সেহেতু তাকে প্রয়োগ করতে গেলেই একটা পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। এই সত্যটা সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য তিনি খুব সুন্দর রাজনৈতিক পরিভাষায় একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যেকোনও মূল নীতিকে যখনই একটা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যাওয়া হবে, তখনই একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। এই দ্বন্দ্বটা হচ্ছে জেনারেলের (সাধারণের) সঙ্গে পার্টিকুলারের (বিশেষের), অর্থাৎ মূল নীতিগুলোর সাধারণ উপলব্ধি ও তার বিশেষ প্রয়োগ — এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এর অর্থ হচ্ছে, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলেই মূল নীতিগুলোর উপলব্ধি আর আগের জায়গায় থাকে না, তা বিকশিত হয়, সম্প্রসারিত হয়, প্রয়োজনে তা অ্যামেন্ডেড (সংশোধিত) হয়, তার ক্যাটিগরিটা পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও উন্নত হতে থাকে। এজন্যই বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণের উপর, অর্থাৎ অবজেক্ট-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তা না হলে বিপ্লবের গোটা ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে যায় সাবজেকটিভ (বাস্তব বিবর্জিত অলীক কল্পনা)।

এখন, লেনিনের এই সিদ্ধান্তটা জানা থাকলেই কি কোনও নেতৃত্ব তার সঠিক প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন? লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদের অসম বিকাশের জন্য প্রতিটি দেশের বিকাশের ঘটনা আলাদা, বৈশিষ্ট্যও আলাদা। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই মার্কসবাদের মূল নীতিগুলোর প্রয়োগও ব্রিটেনে যেভাবে হবে, তেমনভাবে ফ্রান্সে হবে না, আবার জার্মানিতে ও রাশিয়াতে তার প্রয়োগ আলাদা আলাদা হবে । লেনিনের এই কথাটা ধরুন কোনও মানুষ রাজনৈতিকভাবে বুঝলেন এবং একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। কিন্তু, তাতে প্রমাণ হয় না যে, তিনি সেটা উপলব্ধি করেছেন এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। আমাদের মধ্যেও অনেকেই লেনিনের এই তত্ত্বটার কথা বলেন, কিন্তু বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা খেয়ালে রাখতে পারেন না। এটা খেয়ালে রাখা তখনই সম্ভব, যখন যে মূল মার্কসবাদী বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি, চিন্তাপ্রক্রিয়াকে ভিত্তি করে লেনিন এই তত্ত্ব নির্ধারণ করেছেন, সেটা কেউ আয়ত্ত করতে পেরেছেন। একমাত্র তখনই তিনি এই তত্ত্বের মর্মবস্তুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। আর, এটা করতে পারলেই, সেটা বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করতে গেলে কী বিশেষ দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, কী পার্থক্য ঘটছে, তাও তিনি ধরতে পারবেন। আবার, এই পার্থক্যের জন্য লেনিনীয় মূল নীতিগুলো পাল্টে যায় না। যতক্ষণ এগুলো মূল নীতি হিসাবে আছে, ততক্ষণ অবস্থা নির্বিশেষে তার প্রয়োগের তারতম্য হলেও মূল নীতিতে এক থাকবে। কিন্তু মূলগতভাবে এক থাকলেও ডিটেইলস-এ (বিশদ ব্যাখ্যায়) এক থাকবে না। তাই কীভাবে মূলগতভাবে এক আছে, কীভাবে বিশদ ব্যাখ্যায় এক নেই, তা সম্প্রসারিত হয়ে গেছে, পরিবর্ধিত ও উন্নত হয়েছে, কোথায় কোন বিষয়টার উপর দেশ ও পরিস্থিতি বুঝে জোর দিতে হবে — এগুলো বোঝাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সঠিকভাবে বোঝা।

নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লেনিন পার্টি, পার্টি নেতৃত্ব ও অথরিটির ধারণাও সামনে নিয়ে এলেন। নেতৃত্বের প্রশ্নটি এত জরুরি কেন? সে কি শুধু পার্টিকে সুশৃঙ্খলায় চালাবার জন্য? না, শুধু তাই নয়। জনগণকে সক্রিয় ভূমিকায় টেনে আনার জন্যও নেতৃত্ব ও অথরিটি দরকার। কমিউনিস্ট পার্টির এই অথরিটির ধারণাকে ঘিরে যান্ত্রিকতা, আমলাতান্ত্রিকতা, ব্যক্তিপূজাবাদ ইত্যাদি নানা কথা এসেছে। আমরা এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। আমরা জানি, বাস্তব অবস্থার কারণেই পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের চেতনার স্তর, আর কর্মীদের, র‍্যাঙ্ক

অ্যান্ড ফাইলের চেতনার স্তরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আছে। এমনকী, ন্যূনতম যে চেতনার স্তরটা কর্মীদের থাকা দরকার, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে ফাঁক আছে। আবার, পার্টি কর্মীদের চেতনার স্তরের সাথে জনগণের চেতনার স্তরেরও অনেক ফারাক আছে। এই যে নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে চেতনার ন্যূনতম মানের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান, তা কি নেতৃত্ব চাইলেই কমিয়ে আনতে পারে? এটা কমিয়ে আনা একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটবে। যতক্ষণ তা না ঘটছে, ততক্ষণ যেকোনও তত্ত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে এবং সেই অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্রে একটা যান্ত্রিকতা থাকবেই। কিন্তু থাকবে বলেই সে সম্পর্কে আমরা অসতর্ক থাকতে পারি না, তাকে বাড়তে দিতে পারি না। যান্ত্রিকতা যেটা আছে, সেটা বাস্তব সীমাবদ্ধতা। ফলে, তার চরিত্র আমাদের বুঝতে হবে এবং চেতনার মান বাড়াবার জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, আলাপ-আলোচনা-স্টাডি ক্লাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। এভাবে দেশের মধ্যে, গণআন্দোলনের মধ্যে, পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মধ্যে একটা তর্ক-বিতর্কের, আলাপ-আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে চেতনার মানকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকশিত করার রাস্তা, যান্ত্রিকতাকে আটকাবার, তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বাস্তব পন্থা। যান্ত্রিকতার মনোভাব ও তার থেকে যে দোষগুলো বর্তায়, সেগুলো থেকে পার্টি কর্মীদের দূরে রাখবার এটাই হচ্ছে বাস্তব প্রক্রিয়া। কিন্তু তাই বলে আমরা চাইলেই কি সকলের স্ট্যান্ডার্ড (মান) সমান করে দিতে পারি? ওরকম ভাবাটা অবাস্তব। কোনও মার্কসবাদীই এভাবে চিন্তা করেনি। তত্ত্বোপলব্ধির ও তাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে চেতনার এই ব্যবধান, যান্ত্রিকতার এই সীমাবদ্ধতা থাকবেই। এইজন্যই আবার অথরিটির ধারণা একটা বাস্তব প্রয়োজন। এটা ছাড়া কোনও কাজ হতে পারে না, কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

তাই গণতন্ত্র, অধিকার এইসব বড় বড় কথার আড়ালে অথরিটিকে কোনওভাবে লঘু করার চেষ্টা হলে, তার অর্থ দাঁড়াবে বাস্তবে পার্টি নেতৃত্বের অবসান ঘটানো, পার্টি সংহতির অবসান ঘটানো, জনগণকে নেতৃত্বহীন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। অথরিটি বাদ দিলে মতাদর্শগত সংগ্রামকেও একটা খোলা ময়দানের তর্কাতর্কিতে পরিণত করা হবে, বিপ্লবী পার্টিকে একটা লক্ষ্যহীন বিতর্ক সভায় অধঃপতিত করা হবে। এ জিনিস কোনও দিন কোনও বিপ্লবী পার্টি চিন্তা করতে পারে না। ফলে, ব্যক্তিপূজা বা যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নামে অথরিটিকে হেয় করার, লঘু করার কোনও প্রবণতা বা চিন্তাকেই সমর্থন দূরের কথা, বিন্দুমাত্র লঘু করে দেখা চলে না। আমি যদি আমার কোনও আলোচনার ধরন, কোনও প্রশ্ন তোলার ধরনের দ্বারা পার্টি অথরিটিকে খাটো করে ফেলি, তবে তার দ্বারা আমি গুরুতর অন্যায় ও অপরাধ করব। কোনও বিপ্লবী পার্টি সেটা মেনে নিতে পারে না, মেনে নেওয়া উচিত নয়। এখানেই হচ্ছে সীমারেখা। পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কোনও বিষয়ে আলোচনার, তর্কাতর্কির ব্যাপক অধিকার পার্টি একজনকে দেবে। কিন্তু, এই ব্যাপক কথাটার মানে সব সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া নয়। সেখানে সীমাটা হচ্ছে, কেউ আলোচনার নামে অথরিটিকে খাটো করতে পারেন না। অথরিটি সম্পর্কে উপলব্ধিটা কোথাও যান্ত্রিক হচ্ছে মনে করলে, তা নিয়ে কেউ আলোচনা করতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্নটা হবে সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ যে জায়গায় তিনি মনে করছেন, উপলব্ধিটা যান্ত্রিক হচ্ছে, তিনি সে জায়গাটা দেখিয়ে বলবেন, এই জায়গাটার উপলব্ধি যান্ত্রিক হচ্ছে, এখানে বিষয়টা সম্পর্কে বোঝা সঠিক হয়নি বলেই এটা হচ্ছে, বিষয়টা এভাবে বোঝা হলে যান্ত্রিক হত না। প্রশ্নের উত্থাপনাও এভাবে হবে, তবে তার দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলনও উপকৃত হবে। কিন্তু প্রশ্ন ও আলোচনা যদি বড় কথার আড়ালেও এমনভাবে তোলা হয়, যার দ্বারা অথরিটি সম্পর্কেই প্রশ্ন এসে যেতে পারে, তবে তাতে কোনওমতেই সম্মতি দেওয়া যায় না। দিলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়, ক্রুশ্চেভের মতো শোধনবাদীদের হাতে পড়ে যেটা সাম্যবাদী আন্দোলনে হয়ে গেল। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নামে তারা স্ট্যালিনের অথরিটিকে খাটো করে দিল এবং তার পথ বেয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনে শোধনবাদের সিংহ দরজা খুলে দিল। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের মধ্য দিয়েই লেনিনবাদ সঠিক ও সুনির্দিষ্ট উপলব্ধির রাস্তা পেয়েছিল। ক্রুশ্চেভরা সেটাকে ধ্বংস করে দিল। এর ফলে লেনিনের মূল সিদ্ধান্তগুলো যার যেমন খুশি ব্যাখ্যা করার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, পরিণামে আদর্শগত ক্ষেত্রে শোধনবাদ-সংস্কারবাদের অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দেওয়া হল। নাহলে, অনেক দেশেই কমিউনিস্টদের আত্মদান ছিল, সংগ্রাম ছিল, কাজকর্ম ছিল, অগ্রগতি ছিল। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর একটা বিরাট সময় ধরে কেবলই পিছনে হটে এল। অন্ধকার যুগ নেমে এল কমিউনিস্ট আন্দোলনে। ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে ক্রুশ্চেভরা সর্বনাশ করে দিল। ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা অত সোজা নয়। তার জন্য ব্যক্তিপূজাবাদের জন্ম

নেওয়ার মূল কারণটা জানতে হয়। এসব কথা ক্রুশ্চেভরা চিন্তা করেনি। তারা স্ট্যালিনকে খাটো করার দ্বারা সাম্যবাদী আন্দোলনে অথরিটির সমগ্র ধারণাকেই ধ্বংস করে দিল। স্ট্যালিন নিছক একজন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন অথরিটি ধারণার মূর্তরূপ। স্ট্যালিন সম্পর্কে জনসাধারণের ভূমিকার প্রশ্নটা কীসের সঙ্গে জড়িত? স্ট্যালিনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা গৌরবময় স্মৃতি। তাঁর নামের সঙ্গে, তাঁর মর্যাদার সঙ্গে, তাঁর অথরিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা ব্যাখ্যা, যা জানার জন্য মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখতে হলে স্ট্যালিনের দেখানো পথেই যেতে হবে, কোনও ধারণার ঠিক-বেঠিক বিচার স্ট্যালিনের দেওয়া মানদণ্ডেই করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের মেহনতি মানুষের ও কমিউনিস্টদের এই মানসিকতাকেই ধ্বংস করে দেওয়া হল স্ট্যালিনকে মসীলিপ্ত করে, তার অথরিটিকে বিলুপ্ত করার মধ্য দিয়ে।

সাম্যবাদী আন্দোলনে এই অথরিটির ধারণাও লেনিনীয় পার্টি তত্ত্বেরই ধারণা। এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা যদি পার্টির মধ্যে না থাকে, তা গোলগোল ভাষায় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে নেতৃত্ব কথাটার কোনও মানে নেই। স্ট্যালিনের এ বিষয়ে আলোচনা আছে। ট্রটস্কির সঙ্গে আলোচনায় স্ট্যালিন এই নেতৃত্ব বা অথরিটির ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্বের ধারণাটা ভাসাভাসা নয়, বিমূর্ত নয়, সেটা সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব। তা না হলে নেতৃত্ব কথাটার কোনও অর্থই নেই। এ বিষয়ে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট পার্টি এ পর্যন্তই বলেছে, বিষয়টাকে আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে তত্ত্বগতভাবে কিছু করে যাননি তাঁরা। আমাদের পার্টি এ জিনিসটা করেছে। এখানে আমরা ভুল করিনি। নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট ধারণাকে তত্ত্বগতভাবে দাঁড় করানোর দ্বারা আমরা পার্টিকে উগ্র গণতন্ত্র, বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, শোধনবাদ-সংস্কারবাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সীমাবদ্ধতার মধ্যেও, যাতে বিশ্বের অনেক পার্টির যে পরিণতি হয়েছে, আমাদের দেশে সি পি আই, সি পি আই(এম)-এর যা হয়েছে, তা আমাদের যাতে না হয়।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবী তত্ত্ব, বিপ্লবী পার্টির গঠন প্রভৃতির ধারণাটা বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ, বা কিছু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিরূপণের মধ্যেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নয়। এটা সমসাময়িক বিশ্বের ও বিশেষ সমাজের পটভূমিতে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাকে সংযোজিত করে একটা সামগ্রিক জ্ঞানের ধারণা। দল যতক্ষণ এই সামগ্রিক জ্ঞানের ধারণার অধিকারী না হয়, ততক্ষণ দল সত্যিকারের বিপ্লবী তত্ত্বের সন্ধানই পায় না, তা সে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে যত ঠিক কথাই বলুক, আর, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বই থেকে উদ্ধৃতি যতই দিতে পারুক। যে দেশের বিপ্লবী পার্টি নিজেদের শক্তিতে বিপ্লব করেছে, অর্থাৎ অপরের সহায়তায় বিপ্লবের কাজটা সফল হয়ে গেছে তা নয়, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার জ্ঞানকে সংযোজিত করে সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী বিপ্লবী দলকে হতে হয়েছে, তার ভিত্তিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে পথনির্দেশ দিতে হয়েছে। এ ব্যাপারে দুটো মডেল আমাদের সামনে আছে। একটা লেনিনের সময়ে সোভিয়েট পার্টি করেছিল। তারা সক্ষম হয়েছিল। চীনে মাও সে-তুঙের পার্টিও, লেনিনের দেওয়া জ্ঞানের সঙ্গে, চীনের সমাজের মধ্য থেকে আহরিত জ্ঞান তাদের যা ছিল, তার সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয় ঘটিয়েছে। কিন্তু সেটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরলে ভুল ধরা হবে। আজ আবার যেসব সমস্যার সম্মুখীন তারা হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলো সে সম্পর্কে যা বলছে, সেগুলোকে যদি সংযোজিত করে তারা তাদের জ্ঞানকে আরও পরিবর্ধিত করতে না পারে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ নতুন রূপে যে সমস্যার সৃষ্টি করবে, তার মোকাবিলা তারা করতে পারবে না। আর্থিক অগ্রগতি, কারিগরি অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি — এসব সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিবাদের সমস্যার মীমাংসা এখনও হয়নি, ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কী কী প্রশ্নের সম্মুখীন, কীভাবে তাকে সমাধান করতে হবে, তার মীমাংসা হয়নি। বিপ্লবের আগে এই ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে যেসব প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলোকে যেসব কথা বলে মীমাংসা করা গেছে, বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থায় সেই একই কথা বলে তার মীমাংসা করা যাবে, নাকি তা সমস্যা সৃষ্টি করবে — এসব ভাবা হয়নি। ফলে, নতুন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রামটি কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, যথার্থ ব্যক্তি স্বাধীনতার উপলব্ধি কী হবে, এই তত্ত্বের সন্ধান যদি তারা সঠিকভাবে দিতে না পারে, তাহলে সমস্যা হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই ব্যক্তিবাদ চরিত্রের দিক থেকে মূলত বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ হলেও, বিপ্লব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার ধরনধারণ ঠিক বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের মতো নয়। এই দুটোর আলাদা প্রকৃতি দেখাতে গিয়ে আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিবাদের যে রূপ, তাকে 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' বলেছি। মনে রাখা দরকার, সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌঁছে

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ খতম হয়নি। ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম যেটা বুর্জোয়ারা শুরু করেছিল, তার মীমাংসা হয়নি। ব্যক্তির স্বাধীনতার নামে যেটা অর্জিত হয়েছে, সেটা বুর্জোয়া অর্থে ব্যক্তির সমানাধিকার, অর্থাৎ সমাজে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ পাবে যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী। সেই সুযোগকে কেউ বন্ধ করবে না। কিন্তু, ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্ন, যার জন্য ব্যক্তি লড়াই শুরু করেছিল, সেটার মীমাংসা হয়নি। ফলে, প্রশ্ন বার বার আসবেই যে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করা হচ্ছে। সোভিয়েটে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এতদিন বাদেও সোভিয়েট সমাজে এই প্রশ্ন এসেছে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শোধনবাদের জন্য এ জিনিস এসেছে, তা নয়। এটা আসতই। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটা হচ্ছে — আমি যেমনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে চাই, তেমনভাবে আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ বাস্তবেই দিতে পারে না। কারণ, এর সুযোগে নানা প্রতিবিপ্লবী ভাবধারা মাথাচাড়া দেয়। ফলে, তা না দিয়ে ঠিকই করা হয়। কিন্তু তার দ্বারা যে ব্যক্তির যথার্থ স্বাধীনতা ও স্বার্থকে খর্ব করা হয় না এবং কেন করা হয় না, কীভাবে করা হয় না, তা তো বুঝিয়ে দিতে হবে।

এইটে দেখাতে গেলে দেখাতে হবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তির রাস্তা ঐতিহাসিকভাবে যথার্থই কোথায় নিহিত এবং কীভাবে নিহিত। দেখাতে হবে, কেন সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আলাদাভাবে কিছু লড়াই করার নেই। এখানে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রকৃতি কী, এবং সেই দ্বন্দ্বকে কীভাবে নিরসন করতে হবে, তা দেখাতে হবে। এইসব প্রশ্নের বাস্তব তত্ত্বটা গড়ে না তুলতে পারলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামগ্রিক অগ্রযাত্রার পরিপূরক সামাজিক মানসিকতাটা গড়ে উঠবে কীভাবে? সোভিয়েট ও চীনের পত্রপত্রিকা পড়ে আমরা এইসব প্রশ্নের আলোচনার কোনও সন্ধান পাইনি। এজন্যই আমরা বলছি যে, লেনিনের সময় বলশেভিক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় আহরিত সত্যকে যেভাবে সংযোজিত করেছিল, লেনিনের মৃত্যুর পর সে জায়গায় ঘাটতি হয়েছে। দর্শন, বিজ্ঞান সমস্ত ক্ষেত্রে যেসব নিত্যনতুন প্রশ্ন এসেছে, সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে সেগুলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক জ্ঞানে উন্নীত করা হয়নি।

অনেকে মনে করেন, এগুলোর দরকার নেই। এসব না হলেও চলবে। আমি তা মনে করি না। নাহলে শুধু কি বিজ্ঞতা জাহির করার জন্যই লেনিনের 'মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড ইমপিরিও ক্রিটিসিজম' বইটা লেখার দরকার হয়েছিল? আমি মনে করি, ইনটেলেকচুয়াল লেভেল-এ, অর্থাৎ জ্ঞানজগতের সমস্ত ক্ষেত্রে বিপ্লব যদি প্রতিক্রিয়াবাদীদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে না পারে, তাহলে মাঠে-ময়দানে লড়ালড়ির যে আয়োজনটা হয়, সেটা বেশিদূর এগোতে পারে না, তা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। একটা সামরিক লড়াই, একটা সশস্ত্র যুদ্ধ জয় করা মানেই তো বিপ্লব নয়। বিপ্লব হচ্ছে, সমাজের দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে সমাজের ধারাবাহিক অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখা। এই কাজটা সর্বাত্মকভাবে না করতে পারলে, সেই বিপ্লব এগোতে পারে না। তাই পূর্ব ইউরোপের বিপ্লব অপরের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতা দখল করার পরে আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। একই কান্ড ভিয়েতনামের মাটিতেও হতে পারে। আজ ভিয়েতনামের মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কী বিরাট লড়াই করছে, কী বিশাল নৈতিক বলের পরিচয় তারা দিচ্ছে। ইতিহাসের একটা শিক্ষণীয় সংগ্রাম তারা দেখিয়ে দিল। কিন্তু, আমি জানি না, তারা তত্ত্বগতভাবে কতটা কী করেছে। হয়তো তাদের সেটা রয়েছে। কিন্তু যদি এরকম হয় যে, তত্ত্বের এই সন্নিবেশ তাদের হয়নি, তারা শুধু স্বাধীনতার লড়াই করে যাচ্ছে, তবে পরে তাদের সমস্যা খুবই কঠিন হবে। যেমন, চীনের বিপ্লবটা পরে খুবই কঠিন হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতার আবেদনটা সকলেই বোঝে, সহজে সাড়াও দেয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের কাছেও যদি সামগ্রিক বোঝাবুঝিটা এই পর্যন্তই ভাল থাকে, তারপর সব যে যার মতন বোঝা হয়, তবে হাজার প্রাণ দিলেও সেই বিপ্লব শেষপর্যন্ত এগোবে না। লেনিনও বলে গেছেন কথাটা। লেনিনের শিক্ষা অনুসরণ করেই মাও সে-তুঙও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এসে বলেছেন, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিপ্লবে শত্রুকে সরাসরি চেনা যায়, মানুষকে অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝানো যায় — কারা শত্রু, কাদের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপারটা অনেক জটিল হয়ে যায়। কারণ, সেখানে শত্রু থাকে নিজের মধ্যে — পুরনো বুর্জোয়া সমাজের নানা প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা ও বুর্জোয়া চিন্তা-সংস্কৃতির যে প্রভাব মানুষের মধ্যে থেকে যায়, তার মধ্যে। সেখানে মানুষকে কী করতে হবে বোঝাতে গেলে, মানুষের মধ্য থেকেই বাধা আসে। এই বিপ্লব অনেক জটিল। আজ নভেম্বর বিপ্লবকে

আমাদের দেশে স্মরণ করার প্রাথমিক কর্তব্য এই জায়গায়। লেনিনবাদের যে মূল সিদ্ধান্ত, যে বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির কথা আমি বললাম, সেগুলো আপনারা সামনে রাখবেন। নভেম্বর বিপ্লবের আরও অনেক শিক্ষা আছে — যার সমস্ত দিক একটা সভায় আলোচনা করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া, আমি একটা অন্য ধারায় আলোচনা করেছি। আমি যেটা পরিষ্কার করে বলতে চেয়েছি, তাহল, লেনিনবাদী বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন, শুধু লেনিনের কথাগুলো নয়। পন্ডিতসমাজ শুধু লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে যখন জ্ঞান-বিদ্যা জাহির করার চেষ্টা করবে, তখন তার মধ্যে আপনারা খোঁজ করে দেখবেন — এটা আমি আমাদের পার্টির কর্মী-নেতা সকলের জন্যই বলছি — লেনিন ঐ কথাগুলো বলবার পিছনে যে বিচারপদ্ধতিটা অনুসরণ করেছেন, সেটা তাঁরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন কি না। এবং তা করতে পেরে থাকলে, যেমন করে কথাগুলো বলবার কথা, এঁরা তেমনভাবে বলছেন কি না। এইটাই হচ্ছে মূল জিনিস। এইটা পেলে লেনিনবাদকে পাওয়া গেল, এইটা পেলে আমরা লেনিনবাদকে আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করবার যোগ্যতা অর্জন করব। এটা শুধু নেতারা আয়ত্ত করলে হবে না। সমস্ত কর্মীরাও যদি তা আয়ত্ত করতে না পারেন, অন্তত একটা ভাল অংশ যদি আয়ত্ত করতে না পারেন, অর্থাৎ দলগতভাবে আমরা আয়ত্ত করতে না পারি, তবে কিন্তু আমাদের কাজ অনেক শ্লথ গতিতে এগোবে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, চরিত্র থাকা সত্ত্বেও, মূল বিশ্লেষণ, মূল নীতি ঠিক থাকা সত্ত্বেও, এই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও যে গতিবেগ আমরা সৃষ্টি করতে পারতাম, তা আমরা পারব না। কর্মীদের সাংগঠনিক ক্ষমতায় ঘাটতি দেখা দেবে।

আর, পার্টি গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে পার্টি যে চিন্তাগুলোকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তা হিসাবে বিশদ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত করেছে, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। সেটা হচ্ছে, যৌথ নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট ধারণাটি গড়ে তোলার সংগ্রামই হচ্ছে এক অর্থে সঠিক পার্টি গড়ে তোলবার সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এই শর্তটা যুক্ত করেছি। 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইয়ে এই বিষয়টা আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এটা নিজেদের একটা সুবিধার জন্য করা হয়নি। একটা তত্ত্ব হিসাবে এটাকে উন্নীত করার চেষ্টা হয়েছে লেনিনবাদকে ইলাবরেট করার (বিশদ ব্যাখ্যার) দ্বারা।

এগুলো পার্টির নেতা-কর্মীদের বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। যদি কোনও কমরেডের বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে কখনই নিজস্ব মনগড়া বা উল্টোপাল্টা ধারণা দিয়ে বিরুদ্ধতা করতে যাবেন না। পার্টির যেকোনও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই আগে বোঝবার চেষ্টা করবেন। বারবার বোঝার চেষ্টা করে যদি দেখেন যে, বিষয়টা ঠিক বলা হচ্ছে না, এর মধ্যে ত্রুটি আছে, তখন তত্ত্বগতভাবে ভুলটা ধরিয়ে দিন। তার দ্বারা দলও উপকৃত হবে, যদি দলটা তখনও সঠিক থাকে। শুরুতেই 'এটা ঠিক না' বলে উল্টো দিক থেকে শুরু করা শেখবার সঠিক উপায় নয়। এভাবে কেউ কিছু শিখতেও পারে না। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে শেখার মধ্যে 'হ্যাঁ' ও 'না' দুটোই নিহিত থাকে। ঠিক ঠিক শিখতে চাইছি মানেই ঠিক ঠিক দ্বন্দ্ব হচ্ছে। এ না করে যদি প্রথমেই অস্বীকার ও অবিশ্বাস দিয়ে কেউ শুরু করেন, তাহলে তিনি কী করে শিখবেন ? এভাবে শুরু করার অর্থ তিনি অথরিটিকেই, জেনে হোক, না-জেনে হোক, অস্বীকার করছেন। এই মানসিকতা থেকে যদি কেউ মুখে বলেনও যে, তিনি শিখতেই চাইছেন, তবে সেটাও হবে মুখের কথা মাত্র। আসলে তিনি শিখতে চাইছেন না। যথার্থই বুঝতে চাইলে তার মানসিকতাটা হবে অন্যরকম।

যদি ধরুন, কারোর কোনও বিষয়ে সংশয়ও থাকে — যিনি বোঝার স্তরে আছেন, তাঁর এরকম সংশয় থাকতেই পারে — সেরকম ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আগে বোঝবার চেষ্টা করুন, আগেই নিজেকে সব কিছু জেনে ফেলেছেন ভেবে নেবেন না। মনে রাখবেন, অথরিটি না মেনে একজন কোনও কিছু শিখতে পারে না। এবং সেই অথরিটি অবশ্যই নিজের দলের মধ্যকার অথরিটি, বাইরের কেউ নয়। লেনিন প্রথমে প্লেখানভের ছাত্র ছিলেন, প্লেখানভের কাছ থেকেই তিনি শিখতে গিয়েছিলেন। তা শিখতে গিয়ে কি তিনি, আপনি কী বোঝেন, এটা ঠিক না, ওটা ঠিক না — বলে আরম্ভ করেছেন? না, যথার্থ কোনও ছাত্রই তার শিক্ষকের কাছে গিয়ে এভাবে শুরু করে না। লেনিন ছাত্রের মন নিয়েই, শেখবার মন নিয়েই প্লেখানভের কাছে গেছেন। তারপর শিখতে শিখতে প্লেখানভের সীমাবদ্ধতা তাঁর চোখে পড়েছে। আমরাও অনুশীলন সমিতিতে ছিলাম। সেখানে যেসব নেতাদের দ্বারা আমাদের মার্কসবাদে হাতেখড়ি হয়েছিল, তাঁদের কাছ থেকে শিখতে

শিখতেই তাঁদের সীমাবদ্ধতা আমাদের চোখে পড়েছে, আমরা তাঁদের ছেড়ে এসেছি। এটাই হচ্ছে ডায়ালেকটিকস। সত্যিকারের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তর্কবিতর্কের মানে যাঁরা বোঝেন তাঁরাই জানেন, যেকোনও রকম তর্কাতর্কি মানেই মতের বা যুক্তির দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষ নয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তর্কাতর্কির একটা প্রধান শর্ত হচ্ছে, সেটা সচেতন এবং তর্কাতর্কিতে যাঁরা লিপ্ত, তাঁরা সকলেই একটা অথরিটির ধারণা এবং মূল নীতিগুলোর সঠিক উপলব্ধির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এভাবে কেউ না বুঝলে, তিনি শুধু নিজের ব্যক্তিগত ধারণার ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধতাকেই বাড়াতে থাকবেন।

অথরিটির ধারণা ও মূল নীতিগুলোর সঠিক উপলব্ধি — এই কাঠামোর মধ্যেই পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র জীবন্ত রাখা ও কর্মীদের চেতনার মান উন্নত করার বিষয়। তর্কাতর্কিতে বাধা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। যেকোনও প্রশ্নের উপর আলোচনা করার অধিকার দিতে পারলে পার্টিরই ভাল। এই 'যেকোনও' কথাটারও একটা সীমা আছে ও একটা পদ্ধতি আছে। আমার এই 'যেকোনও' কথাটার থেকে ধরে নেবেন না যে, যেকোনও প্রশ্ন, যেকোনও ফোরামে, যেকোনও সময়ে বিনা মতামতে আমরা তুলতে পারি। তা নয়। আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, যতটা ব্যাপক গন্ডি ধরে নানা ফোরামে নানা প্রশ্ন আলোচনা করা, মতামতের সংঘর্ষ করা যায়, তা করা দরকার। যেমন, একটা বিশেষ স্লোগান নিয়ে, একটা নীতি, কর্মসূচি বা কৌশল নিয়ে, কারও সঙ্গে ঐক্য করা না-করা নিয়ে একটা মতের বিরুদ্ধে আর একটা মতের তর্কবিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু, মূল নীতিতে বিরুদ্ধতা করলে আর সেটা আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম থাকে না। সেই সংগ্রামটা পার্টির সঙ্গে পার্টির বাইরের লোকের সংগ্রাম হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, মূল নীতি নিয়ে বিরোধিতা হয় না। মূল নীতি বোঝবার জন্য, আরও ভাল করে বোঝবার জন্য, যদি কারও বোঝায় গন্ডগোল থাকে, তা দেখাবার জন্য আলোচনা হতে পারে। কিন্তু মূল নীতিগুলোই ঠিক কি না — এই প্রশ্ন করা যায় না। কারণ, তার অর্থ দাঁড়ায়, যে মূল নীতির উপর পার্টি দাঁড়িয়ে আছে, সে সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করা। এ চলে না। এ হয়তো না বুঝে অনেক কমরেড করেন। তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে, এর দ্বারা না চাইলেও, পার্টি অথরিটিকে খাটো করা হয়। এর ফলে আর পার্টির কিছু থাকে না। এ কোনও বিপ্লবী পার্টি মেনে নিতে পারে না। পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের যত ব্যাপক পরিবেশই থাকুক, তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এ সম্পূর্ণ অন্য জাতের জিনিস। এ চলতে পারে না। এ সম্বন্ধে সমস্ত কমরেডদেরই সচেতন থাকা দরকার। নাহলে পার্টিতে মার্কসবাদের নামে উগ্র গণতন্ত্র ও ব্যক্তিবাদ কায়েম হবে। আর, গণতন্ত্র বলতে যা থাকবে, তা হবে নেহাতই একটা নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ফলে, সেই অবস্থায় পার্টি একটা ব্যুরোক্রেটিক পার্টিতে অধঃপতিত হবে। ব্যুরোক্রেসি আটকাবার জন্যই, অন্ধতাকে রোখবার জন্যই, অথরিটি দরকার। অথরিটিকে মেনে চলার দ্বারা অন্ধতা বাড়ে না, অন্ধতা বাড়ে চেতনার নিম্নমানের জন্য। অথরিটিকে মানবার কথা বারবার বলার দ্বারা অন্ধতা আসে না, অন্ধতা আসে তাকে ঠিকমত না বুঝে বলার দ্বারা। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থ হচ্ছে, ঠিকমতো বুঝে বলছে কি না সেটা দেখা ও ভুল বুঝে বলে থাকলে ঠিকটা কী হবে তা ধরিয়ে দেওয়া।

এই বিষয়গুলোর সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে যদি আমরা পার্টিকে সংহত করতে পারি, তাহলে আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও হাজার এক রকমের সমস্যা থাকলেও আমরা এগোব। আমাদের সমস্যা অনেক। অন্যান্য পার্টির থেকে তুলনামূলক শক্তির অর্থে আমাদের পার্টিতে ডেডিকেটেড কর্মীর সংখ্যা হয়তো বেশি। আমাদের কর্মীদের চারিত্রিক গুণাবলীতে আমরা গৌরবান্বিত। চেতনার মানের দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের কর্মীদের যুক্তি-তর্ক করবার ক্ষমতাও অন্য দলের কর্মীদের চেয়ে নিম্নস্তরের তো নয়ই, বরং উন্নতই। এক দল কমরেডের ক্ষেত্রে তো খুবই উন্নত, যা অন্য দলের নেতাদেরও নেই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যেটার ঘাটতি রয়েছে, তা হল, সমস্যাকে মোকাবিলা করার মতো উপযুক্ত জ্ঞান ও ক্ষমতার অভাব। এখানেই বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনের অনুপাতে তুলনামূলক ক্ষমতার কথা যদি ধরি, তাহলে আমাদের ক্ষমতাটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ক্ষমতাই। এই দুর্বলতা আমাদের থাকলে কাজ হবে না।

যতখানি যোগ্যতা নিয়ে সি পি আই, সি পি আই (এম)-এর চলতে পারে, আমাদের দলের কর্মীদের ততটুকু যোগ্যতা নিয়ে চলে না। প্রথমত, আমাদের দলের কর্মীদের একদিকে আর্থিক সমস্যা, অভাব-অনটন — তাদের আমরা আর্থিক সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করে দিতে পারি না। ফলে, আমাদের দলের বেশিরভাগ সক্রিয় কর্মীকেই তাদের নিজেদের আর্থিক ঝঞ্ঝাট নিজেদেরই সামাল দিতে হয়, তারই সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক

দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। অন্যদিকে, ঐ সমস্ত দলে বেশিরভাগ সক্রিয় কর্মীকেই তারা আর্থিক ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করে রাখে, যাতে খানিকটা সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে তারা কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তারা বড় দল। তাদের পিছনে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। তাদের পক্ষে প্রেস প্রচার করে দেয়। দেশের মানুষ তাদের বড় পার্টি বলে জানে। আর, তাকে কেন্দ্র করেই মানুষের মধ্যে তাদের প্রতি একটা সমর্থনসূচক মানসিকতা কাজ করে। পাশাপাশি আমাদের অবস্থা বিচার করুন। আমরা যে কমিউনিস্ট, তা প্রমাণ করতেই আমাদের জান কয়লা হয়ে যাচ্ছে। এতদিন বাদে আজ একটা অংশের কাছে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু, আমরা কী চাই, আমাদের মতামত কী, আমরা কী ধরনের পার্টি — এসব এখনও বেশিরভাগ মানুষকে আমরা জানিয়ে উঠতে পারিনি। একদিকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে, তার সঙ্গে রয়েছে আমাদের অর্থ, প্রচার-প্রোপাগান্ডা সহ হাজার একরকমের সমস্যা। অপরদিকে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত যে দুটো কমিউনিস্ট পার্টি, তারা কেন কমিউনিস্ট পার্টি নয়, কেন তাদের আমরা মেকি কমিউনিস্ট বলছি, তা জনগণকে বোঝানো এবং বুঝিয়ে তাদের প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করার সমস্যা।

এইরকম জটিল অবস্থায় আমাদের যারা কর্মকর্তা হবে, সংগঠক হবে, তাদের কি অত সহজে অগ্রগতি ও বিকাশ হতে পারে, যত সহজে সি পি আই (এম)-এর হতে পারে ? তাদের দলের কর্মকর্তাদের চেয়ে আমাদের দলের কর্মকর্তাদের যদি একটু বেশি বিদ্যাবুদ্ধি এবং সংগঠন ক্ষমতাও থাকে, তাহলেও সংগঠনের অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিতে গিয়ে দেখা যাবে, আমাদের দলের কর্মকর্তারা ততটা করে উঠতে পারছে না, যতটা তারা পারছে। তাই আমাদের স্তরটাকে উন্নত করতে হবে। এছাড়া, আমাদের রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় কর্মকর্তা ও নেতার অভাব, স্টাডি ক্লাস নেওয়ার লোকের অভাব। একটা-দুটো নয়, ব্যাপক সংখ্যায় স্টাডি ক্লাস চালাবার মতো লোক আমাদের নেই। তার মানে কি বই পড়ে মার্কসবাদের ক্লাস নিতে পারেন, এমন লোকের আমাদের অভাব আছে ? না, এমন লোক খুঁজলে আমরা পাব। অধ্যাপক মহল আছে, অন্যান্য অনেক লোক আছেন, যাঁরা বই ধরে ধরে লেনিন কী বলেছিলেন, মার্কসবাদের কোনটা কী তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন, যা সি পি আই, সি পি আই (এম) করে। ওদের পার্টি চালায় এক দল লোক, নেতা এক দল লোক, আর ক্লাস নেয় আর এক দল লোক। একটা সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি জানে যে, এই স্টাডি ক্লাস সঠিক রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার। নতুন নতুন কর্মীরা এই ক্লাসগুলোতে আসবে। ফলে, যারা ক্লাস নেবে, তারা মার্কসবাদকে কীভাবে ব্যাখ্যা করল, দলের নীতিগুলোকে কীভাবে উপস্থাপনা করল, রেফারেন্সগুলো কীভাবে টেনে আনল ও ব্যাখ্যা করল — সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, স্টাডি ক্লাসের মধ্য দিয়ে যদি এই পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি, পার্টির রুচি-সংস্কৃতির ধারণা, পার্টির মানসিকতা, পার্টির চিন্তাপ্রক্রিয়া ও বিচারপদ্ধতি কর্মীদের ভিতর গড়ে দেওয়া না যায়, তবে সবটাই ব্যর্থ। এই কাজটা কারা পারে ? পারে তারাই যারা পার্টির কর্মকর্তা, যারা পার্টি-জীবনের অঙ্গ, যারা পার্টির চিন্তাভাবনা-মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ, পার্টি অথরিটি সম্বন্ধে যারা নিঃসংশয়। এটা তারা শুধু মুখের কথায় বলে না, তাদের কাজ, তাদের আচার-আচরণ, হাবভাব, মুখ চোখ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই তা পরিস্ফুট।

এই ধরনের লোক ছাড়া স্টাডি ক্লাসের দায়দায়িত্ব কি শুধু মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলেই কাউকে দেওয়া যায় ? তাহলে তো প্রফেসরদের দিয়েই এটা হয়। না, হয় না। কেননা, তাহলে পার্টির 'ইউনিফর্মিটি অব থিঙ্কিং'টাই নষ্ট হয়ে যাবে। কোনও বিপ্লবী পার্টি তা করে না, করতে পারে না। আর, এইদিক থেকে পার্টিতে এখনও উপযুক্ত লোকের সংখ্যা খুবই কম। যত প্রয়োজন ক্লাস নেওয়ার তত লোক নেই। কাজেই যোগ্য কর্মকর্তা চাই। লোকাল সেক্রেটারি থেকে স্তরে স্তরে এমন নেতা চাই, যারা পার্টি কমরেডদের আস্থা অর্জন করতে পারে। কর্মীদের ব্যক্তিগত সমস্যা, পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমস্যা যাই থাকুক, তারা মোটামুটিভাবে নিজ নিজ স্তরে সকল কমরেডের আস্থা অর্জনে সক্ষম, প্রত্যেকেই তার তার নিজস্ব কাজের ক্ষেত্রে একজন অথরিটি, যে অথরিটিটা উপর থেকে চাপানো নয়, কর্মীদের মধ্য থেকেই স্বাভাবিকভাবে যার উত্থান ঘটেছে, যাকে সমস্ত কর্মীরা মানে। তার ফলে সে সমস্ত কর্মীদের যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করাতে পারে। এমন ধরনের কর্মকর্তার আমাদের অভাব। এখন কী হয়? কাজ চালাবার জন্য একটা কমিটি করে তার একজন ইনচার্জ করে দেওয়া হয়, যার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কম্যান্ড ঠিকমতো কাজ করে না। আবার, যদি কোথাও কম্যান্ড কাজও করে, জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখার ও তাদের উপর প্রভাব ফেলবার ক্ষমতা নেই।

এই যে সমস্যা, এর সঙ্গেই পার্টির অগ্রগতির প্রশ্ন যুক্ত হয়ে আছে। প্রকৃত সমস্যা কী, তার চরিত্র কী, সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে না বুঝে ও সমাধানের চেষ্টা না করে আমরা যদি সব এদিক ওদিক ভাবতে থাকি, তাহলে পার্টির কাজ এগোবে না। এগুলো হচ্ছে সমস্যার দিক। এগুলো দ্রুত কাটানো দরকার। এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে আমাদের পার্টির গুরুত্ব বাড়ছে। ইতিমধ্যেই একটা জিনিস হয়েছে। এই পার্টিটা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কোনও শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিরই আজ আর অজানা নেই — তারা আমাদের স্বীকৃতি দিতে চাক, না চাক। তারা অনেকেই আমাদের মতামত জানতে উৎসাহ বোধ করে, আমাদের পত্রপত্রিকাগুলো রাখে, তাদের পত্রপত্রিকা আমাদের সঙ্গে বিনিময় করে। আমরা আজও বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে, প্রয়োজনীয় ভূমিকার কথা বাদ দিন, কোনও ভূমিকা পালন করার অবস্থায় যেতে না পারলেও আমাদের একটা গুরুত্ব হয়েছে। তারা আমাদের সম্পর্কে অন্তত এটুকু জেনেছে যে, আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন-এ চিন্তা করি এবং আমরা সাম্যবাদী শিবিরের পার্টি। আমরা যখন যখন বিদেশে আমাদের কাউকে পাঠাতে পেরেছি, আমাদের কাগজপত্র রাখার ব্যাপারে অনেকগুলো পার্টির ক্ষেত্রে উৎসাহের প্রমাণ পেয়েছি। ফলে, আমাদের পার্টিকে যদি আর একটু শক্তিশালী করতে পারি, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোতে আরও খানিকটা বেশি ভূমিকা পালন করতে পারি, সেটা ক্রমাগত বাড়াতে পারি, তাহলে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনেও খানিকটা ভূমিকা পালন করার জায়গায় আমরা আসতে পারি।

পরিশেষে, আমি কমরেডদের অন্য একটা বিষয়ে দু'চার কথা বলব। বর্তমানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে হতাশা, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে হতাশা, তার একটা প্রভাব কর্মীদের একাংশের, এমনকী ভাল কর্মীদের একাংশের মানসিকতার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুখে তারা না বললেও, তাদের কাজে-কর্মে এক ধরনের জড়তা দেখা যাচ্ছে। এটা বিপ্লবী কর্মীদের হওয়া ঠিক নয়। আমরা তো বিপ্লবী কর্মী এইজন্যই, যাতে জনতাকে তার দুঃসময়ে সবচেয়ে বেশি আমরা সাহায্য করতে পারি। জনতা হতাশায় ভুগছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা হতাশায় ভুগছে, এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদার মানুষগুলোর পক্ষে সবচেয়ে দুঃসময়। এই দুঃসময়ে বিপ্লবী দলের কর্মীদেরই সবচেয়ে বেশি নিরলসভাবে কাজ করে তাদের সাহায্য করা দরকার, নিজেদের উদ্যোগ বাড়ানো দরকার। গাড়ি যখন খুব স্বাভাবিকভাবেই জোরে চলে, তখন শুধু স্টিয়ারিংটা ধরে রাখলেই হয়। কিন্তু গাড়ি যখন ঠিকমত চলে না, তখনই দরকার হয় পরিশ্রম ও সতর্কতার। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রশ্নে, জনসাধারণের মানসিকতার প্রশ্নেও কথাটা একই। পরিস্থিতি যত প্রতিকূল, বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের পরিশ্রম, সক্রিয়তা, উদ্যোগ হবে তত বেশি। না হলে প্রতিক্রিয়াবাদীদের ষড়যন্ত্রই সফল হবে। যদি আমরা সত্যই বিশ্বাস করি যে, মানুষ মার খেয়েও বারবার লড়াইয়ের ময়দানে আসবে, কিন্তু ততদিন তা বারবার বিফলতায় পর্যবসিত হবে, নানা রাজনৈতিক দল মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা রাজা-উজির হয়ে সাময়িক স্বার্থ গুছিয়ে নেবে, হতাশা মানুষকে গ্রাস করবে, যতদিন পর্যন্ত না মানুষের এই আন্দোলনগুলোকে, লড়াকু মানুষগুলোকে সঠিক পথে চালনা করে সঠিক পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যোগ্য নেতৃত্বদানকারী পার্টি এস ইউ সি আই-এর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। এ যদি আমাদের কর্মীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, তাহলে আজকের এই হতাশার মুখে তাঁদের আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করার কথা। শুধু কর্মীরাই নয়, যাঁরা পার্টির সমর্থক, দরদী, যাঁরা সবসময় সক্রিয় কর্মীদের মতো কাজ করতে পারেন না, তাঁদেরও মানসিকতাটা হবে — আমাদের সংসার ও অন্য পাঁচটা দায়দায়িত্ব পালন করার পরও যতটুকু কাজ আমরা করতে পারি, আর্থিক, কায়িক যেভাবে যতটুকু মদত পার্টির কর্মকাণ্ডে আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব, তাতে আমরা 'না' বলব না, আমরা তা করব। এটা না হয়ে সমাজের মধ্যকার হতাশা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যকার হতাশা যদি কর্মীদের, নেতাদের বা নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মানসিকতাকে খানিকটা আচ্ছন্ন করে এবং গতানুগতিকতার রোগে ধরে, তাহলে আমরা কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা করব ? কোনও একটা পার্টি বড় হলেও, এ ঘটনায় মুষড়ে পড়বে। আর, আমরা এমনিই এখনও ছোট, পার্টির বিস্তৃতি ঘটা সত্ত্বেও আজও আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতার বিচারে প্রয়োজনের তুলনায় ছোট। তার উপর চারদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে আমাদের কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। এই অবস্থায় আমাদের আপন ঘাঁটিগুলো রক্ষা করে এই হতাশাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত জনগণের মধ্যে গিয়ে আমাদের কাজ ও সংগঠন বাড়াতে হবে। আমরা যদি মনে-প্রাণে বিপ্লবটা চাই, খেলা করতে না চাই, তাহলে আমাদের প্রচন্ড তেজে খাড়া হওয়া

দরকার। খেলা করার কোনও মানে হয় না। বিপ্লবে রইলামও, অথচ কাজ করলাম না ; এই পার্টিকে সঠিক ভেবে তার সঙ্গে আছি, অথচ দায়দায়িত্ব পালন করছি না, এরকম নয়। এর নাম খেলা করা। এর কোনও সার্থকতা নেই। আমার এই কথাটা আপনারা গভীরভাবে ভাববেন।

আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমাদের শক্ত হাতিয়ার চাই। এই শক্ত হাতিয়ার হচ্ছে, প্রথমত, কর্মীদের লৌহদৃঢ় ঐক্য ও অটুট মনোবল। সমস্ত রকমের নৈরাশ্য কর্মীদের ঝেড়ে ফেলতে হবে। দেখতে হবে, সমাজের এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হতাশা যেন তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার না করে। দ্বিতীয়ত, সমর্থকবৃন্দের কাছে আবেদন জানাতে হবে, যাতে তাঁরা তাঁদের মতো করেই যেভাবে যতটুকু পারেন কাজ করেন, নিজে ভাবেন এবং পার্টিকে সাহায্য করেন। তৃতীয়ত, পার্টির নেতৃত্বের ধারণাকে আপনাদের অটুট রাখতে হবে। চতুর্থত, প্রতিনিয়ত জনগণের মাঝে যেতে হবে, তাদের মধ্যে থাকতে হবে এবং তাদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে হবে। এই চারটি কাজ আপনাদের অমোঘ শক্তি দেবে — এমন একটা শক্তিশালী হাতিয়ার দেবে যার প্রয়োগের দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই বর্তমান অবস্থার মোকাবিলা করতে পারব। একথা বলেই আজ নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর,
মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৫৪তম বার্ষিকী
উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলকাতার মহাজাতি
সদন হলে প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি
বাংলা মুখপত্র গণদাবীর
বিশেষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।